পরশ পাথর

কাওছার আলম শিবলী

বি. এ. অনার্স
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অগ্রযাত্রা প্রকাশনী, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব **লেখক**

প্রকাশক অগ্রযাত্রা প্রকাশনী
৩১৪/এ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৮ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ আকরাম হোসেন

বিন্যাস শাইনিং কম্পিউটার্স
কাটাবন, ঢাকা

মুদ্রণ ক্ল্যাসিক প্রিন্টিং প্রেস
কাটাবন, ঢাকা

মূল্য **১২০.০০ টাকা মাত্র**

প্রাপ্তিস্থান

আল মারুফ পাবলিকেশন্স	**প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স**
কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স	মাদ্রাসা মার্কেট
কাটাবন মোড়, ঢাকা।	বাংলাবাজার, ঢাকা।

POROSH PATHOR, WRITTEN BY KAWSAR ALAM SHIBLY, (B.A. HONORS, DEPT. OF ARABIC, UNIVERSITY OF DHAKA), PUBISHED BY OGROZATRA PROKASHONI, PUBLISHED ON NOVEMBER, 2018.

PRICE: 120.00 BDT, 5.00 USD.

ভূমিকা

“যার জ্ঞান আছে, তার কী নেই?

তার কী আছে? যার জ্ঞান নেই!”

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সকল জ্ঞানের একমাত্র উৎস। দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (সা.) এর প্রতি, যিনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তিতে জাহিলিয়াতের অন্ধকার দূর করেছিলেন।

রাসূল (সা.) এর আগমনের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাস নানা সময়ে নানা পালা বদলের সাক্ষী হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাসের নানা দিক আজ কম-বেশি সবারই জানা। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও আজকের পদস্থলন যে সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা, সেটাও কারো অজানা নয়। তবে একটি বিষয় নতুন করে ভাবা সময়ের দাবী, তা হলো মুসলমানদের প্রকৃতপক্ষে সমস্যা কোথায়? কিসের অভাবে তাদের অস্তিত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন? তাদের ঈমানী চেতনা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পিছনে মূল কারণ কি?

এসবের উত্তর খুঁজতে গিয়েই কলম ধরা। আমি লিখছি জানার জন্য, কাউকে জানানোর জন্য নয়। এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি একজন মুসলিম যুবকের চিন্তাধারা, যে ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে ভাবে। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের পদস্থলন যাকে ভাবায়। সে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে নিজেকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে। লেখাটিতে তার চিন্তাধারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, নিজের সাথে কথোপকথনের মতো করে।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস কিংবা প্রবন্ধ কোনটিই লেখার যোগ্য নিজেকে মনে করি না। কাব্যের ছন্দ, গল্প-উপন্যাসের কাহিনী বা চরিত্রের সামঞ্জস্য, প্রবন্ধের যুক্তির প্রখরতা কোনটিই আমার পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। সেগুলো অর্জনের জন্য সময় ব্যয় করার চাইতে শুধু নিজের চিন্তা পাঠকের সামনে প্রকাশ করাটাকেই বেশি প্রয়োজন মনে করলাম। তাই আমি বলতে পারবো না, এ লেখাটি আসলে কি?

এটা গল্প নয়, কারণ এতে কোন চরিত্র নেই। এটা উপন্যাস নয়, যা ধাপে ধাপে দীর্ঘ বর্ণনার মধ্য দিয়ে কারো জীবনের গল্প তুলে ধরে। এটা প্রবন্ধ নয়, যাতে যুক্তির প্রখরতা খুব সহজ ভাষার মোড়কে লুকানো থাকে। এতে কথোপকথন থাকলেও এটা নাটক নয় চরিত্রের অভাবে। তবুও লিখছি। কারণ সাহিত্য রচনা এক অর্থে মনের খোরাক মেটানো।

লেখাটি লিখতে গিয়ে পদে পদে উপলব্ধি করেছি নিজের জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানী ব্যক্তিদের লেখনীর তুলনায় এটা নিতান্তই কালি-কলমের অপচয়। তাই সে অপচয় বেশি করার সাহস করিনি, যথাসম্ভব সংক্ষেপেই শেষ করার চেষ্টা করেছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাদের, যাদের সাহচর্য ও জ্ঞানের শক্তির কিছু ঝলক আমার কলমের অগ্রভাগ দিয়ে বের হয়েছে। নিজের বলতে আমার কিছুই নেই। লেখাটি যদি চিন্তা-শীলদের মনের খোরাক হতে পারে, কিংবা হতে পারে কারো জ্ঞানার্জনে আগ্রহ তৈরির মাধ্যম, তবেই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে। তাই একে জ্ঞানহীনের জ্ঞান বিতরণের অপচেষ্টা মনে না করে, যাবতীয় ভুল ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি।

কাওছার আলম শিবলী

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

জ্ঞান নামক পরশ পাথরের সন্ধানে বেরিয়ে যারা দুর্গম পথের আড়ালে হারিয়ে গেছেন, তাদের জন্য।

সূচিপত্র

ইতিহাসের অবতারণা (আবেগ)..... ৯
প্রথম প্রশ্নঃ আমাদের সমস্যা কোথায়? ১৮
অতীতে মুসলমানদের উন্নতির মূল শক্তি কি ছিল?..... ২১
জ্ঞানের সাথে পরিচয় ২২
জ্ঞানের স্তরভেদ ২৪
জ্ঞানের রাজ্য..... ২৬
দর্শন.....২৭
চিন্তা ২৯
বিশ্বাস ৩১
সত্য ৩৩
জ্ঞানের রূপক ব্যাখ্যা.....৩৪
জ্ঞান কেন আলো? অজ্ঞতা কেন অন্ধকার?.....৩৫
জ্ঞান অর্জন কিভাবে হবে? ৩৬
সকল জ্ঞানের আধার ৩৮
মানব জ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য ৪০
জ্ঞান প্রকাশ করা কি জরুরী? ৪১
জ্ঞান প্রকাশের মাধ্যম; বলা ও লেখা ৪৩
যুক্তি-তর্ক বনাম বিশ্বাস.....৪৪
সত্যের সন্ধানে কোনটি অগ্রগণ্য? ৪৬
বিশ্বাসের সামনে যুক্তি মূল্যহীন কেন? ৪৮
শুধু চোখে দেখা জিনিসের উপর বিশ্বাস কেন অসম্পূর্ণ?.....৫০
যুক্তি-তর্কে জ্ঞানের বিস্তার কতটুকু ঘটে?..... ৫১
জ্ঞানের শক্তিঃ অতীত ৫৩

যেখানে জ্ঞান ব্যতীত সবই অক্ষম..... ৫৮
জ্ঞানহীনতার ভয়াবহতা: বর্তমান..... ৬০
পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত..... ৬৫
রাসূল (সা.) এর একটি হাদীস..... ৬৭
একটি উক্তি..... ৬৯
একটি পঙক্তি..... ৭১
একটি প্রবাদ..... ৭৩
শেষ প্রশ্ন: সাগর কবে পাহাড়ের গায়ে আঘাত হানবে?..... ৭৫
ইতিহাসের পুনঃঅবতারণা (বিবেক)..... ৭৭

ইতিহাসের অবতারণা (আবেগ)

আমি এমন একটি সময়ের কথা বলছি, যখন আরবের মরুর উত্তাপ বেড়ে গেছে বহুগুণ। যখন মরুভূমির প্রতিটি ধূলিকণা চৌদ্দ শতাব্দীর বিরহ বেদনা ভুলে গিয়ে অবশেষে ক্ষোভের অনলে ফুটছে। যখন ধূসর মরু তার বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের বিচরণের ইতিহাস গর্বভরে প্রকাশ করার পরিবর্তে লজ্জাভরে গোপন করছে। কারণ, তার বুকে তখন মরুচারী সংগ্রামীদের ঘোড়ার ক্ষুরের বদলে শোভা পাচ্ছে বিলাসীদের উন্মত্ত নৃত্য।

এটা সে সময়ের কথা, যখন কোরআনের সুরের পরিবর্তে নর্তকীর নিক্কণ-ধ্বনিই বেশি প্রিয়। যখন মরীচিকার মাঝে রঙিন স্বপ্ন দেখে চোখ জুড়ায় বেদুইনদের উত্তরসুরিরা। যখন ভুবনমোহিনী সৌন্দর্যের ফাঁদে আটকা পড়েছে মরুচারীদের বিবেক, গায়িকার কণ্ঠের জাদুতে মোহিত হয়েছে তাদের কর্ণকুহর, নারীর আঁচলের পরশ তলোয়ারকে করে দিয়েছে ধারহীন, তরবারির বদলে হাতে শোভা পাচ্ছে নেশাতুর পানীয়ভর্তি পাত্র, বিলাসিতা হাতকে করেছে অবশ, হাত থেকে ছিটকে গেছে তাদের ঢাল, তাদের বাঁচানোর আর কেউ নেই।

এটা সে সময়ের কথা, যখন আরবের মাটি মুজাহিদদের রক্ত পানের ইতিহাস আকড়ে বেঁচে আছে। যখন মরুবাসীদের দেখে কেউ বলবেনা, এ মাটিতেই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মু'জিযা[১] দেখা গিয়েছিল। যখন হেজাজ থেকে ইরানের পথের প্রতিটি ধূলিকণা খুন রাঙা ইতিহাস গোপন করতে চাইছে। যখন কায়সার-কিসরা'র যুগের ক্ষমতালোভীদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নতুন রূপে ফিরে এসেছে মুসলমানদের হাতে।[২] এটা সে সময়ের কথা, যখন দজলা-ফোরাতের প্রতিটি ঢেউ চিৎকার করে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আর তাদের আর্তনাদ শোনার চেষ্টা করছে কোন আত্মাভিমানী মন-

"আমরা তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন কিসরার প্রাসাদে ফাটল ধরানো বীর সেনানীরা আমাদের বুকে ঘোড়া নামিয়েছিল, আর আমরা তাদের পদচুম্বন

---

১. আরবের মাটিতে ইসলামের প্রকাশই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মু'জিযা।

২. সৌদি রাজবংশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রতি ইঙ্গিত।

করে ধন্য হয়েছিলাম।[৩] আমরা তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন হাসান-হোসাইনের রক্তে আমাদের দেহ রঞ্জিত হলো। আমরা তখনও প্রবাহিত হচ্ছিলাম, যখন লক্ষ লক্ষ বই নিক্ষেপ করে আমাদের স্রোত রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হলো।[৪] আমরা তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন কারামতীরা কাবার প্রান্তরে রক্ত ঝরাচ্ছিল।[৫] আমরা তখনও প্রবাহিত হচ্ছি যখন মুজাহিদদের রক্ত পানকারী আরবের মরু পান করছে বিদেশীদের তৈরি মদের উচ্ছিষ্টাংশ।"

এটা সে সময়ের কথা, যখন হাজ্জাজের হাতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের রক্ত ঝরার ইতিহাস ক্ষত হয়ে জেঁকে বসেছে মহাকালের বুকে। যখন জাতির এক অসহায় কন্যার রক্তে লেখা পত্রের ভাষায় হাজ্জাজের পৌরুষ জেগে উঠার কাহিনী মনে করিয়ে দিচ্ছে ইতিহাসের আরেক মু'জিযাকে। যখন সাহাবী-পুত্রকে হত্যাকারী ব্যক্তি ইসলামের মহান উপকারকারী বনে যাওয়ার ইতিহাস মানুষ ভুলতে বসেছে।[৬] এটা সে সময়ের কথা, যখন আত্মভোলা জাতির দিকে

---

৩. পারস্য বিজয় অভিযানে মুসলমানদের সামনে বাঁধা হয়ে দাড়ায় দজলা নদী। শত্রুরা সবগুলো নৌকা দখল করে রেখেছিল এবং পুলগুলোও ভেঙ্গে দিয়েছিল। এ অবস্থায় সিপাহসালার হযরত আবু উবায়দা (রা.) এর নেতৃত্বে মুজাহিদরা পানিতে ঘোড়া নামিয়ে দেন।

৪. হালাকু খান বাগদাদে আক্রমণের পর মুসলমানদেরকে জ্ঞানশূন্য করার জন্য বড় বড় লাইব্রেরি ধ্বংস করে অসংখ্য বই নদীতে ফেলে দেয়। বলা হয়ে থাকে, এ সময় বইয়ের স্তুপের ফলে ফোরাত নদীর স্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

৫. আবু তাহের সোলায়মান কারামতী ছিল একজন ভন্ড নবী। ৩১৭ হিজরীতে তার অনুসারীরা হজ্জ করতে গিয়ে কাবার প্রান্তরে প্রচুর রক্তপাত ঘটায়। ইহরাম পরিধানকারী নিরস্ত্র হাজীদের রক্তে রঞ্জিত হয় মসজিদে হারাম। তারা কাবা শরীফের দরজাও ভেঙ্গে ফেলে। এরপর কাবার গিলাফ ছিড়ে টুকরো টুকরো করে হাজরে আসওয়াদ নিয়ে চলে যায়। তাদের সাথে মুসলমানদের দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। কাবার প্রান্তরে রক্তপাতের ফলে ১০ বৎসর (৩২৭ হিজরী পর্যন্ত) হজ্জ বন্ধ ছিল।

৬. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক এবং তার পুত্র ওয়ালিদের শাসনামলে বসরার শাসনকর্তা ছিলেন। আব্দুল মালিকের শাসনামলে বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি মক্কা অবরোধ করেন। প্রখ্যাত সাহাবী যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) এর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর তার বিরুদ্ধে জিহাদে শাহাদত বরণ করেন। হাজ্জাজ প্রথমদিকে ছিলেন এমন একজন হৃদয়হীন শাসক যে, সাহাবী-পুত্রের মৃত্যুও তার মনে কোন অনুভূতির সৃষ্টি করেনি। অথচ এই ব্যক্তিই শেষ জীবনে এসে তুর্কিস্তান, আফ্রিকা এবং সিন্ধুর মাটিতে ইসলামের বাণী প্রচারে অবদান রাখেন। তিনিই প্রথম কুরআনে হরকত সংযোজন করেন। আল্লাহ তায়ালার অন্যতম একটি কুদরতী রহস্য যে, হাজ্জাজের মতো যালিম শাসকের দ্বারাই তিনি ইসলামের কিছু বড় খেদমত করিয়েছেন।

তাকিয়ে সূর্য চোখ রাঙিয়ে বলছে-

"আমি তখনও তোমাদের আলো দিচ্ছিলাম, যখন খালিদের তরবারির আঘাত সইতে না পেরে কায়সার-কিসরা শাম ত্যাগ করলো।[৭] আমি তখনও তোমাদের আলো দিচ্ছিলাম, যখন আমর ইবনুল আসের সাথীরা আজনাদাইনের প্রান্তরে রোমীয়দেরকে জাহান্নামের পথ দেখাল।[৮] আমি তখনও উদিত হচ্ছিলাম, যখন আরব মাতাদের স্তন্যের শক্তি তাদের সন্তানদের অবতরণ করাচ্ছিল তুর্কিস্তান, আফ্রিকা, সিন্ধু আর স্পেনের মাটিতে।[৯] আমি তখনও তোমাদের আলো দিচ্ছিলাম, যখন কাসিমের পুত্রের বীরত্ব হাজারো যুবককে উৎসাহিত করলো শাহাদতের তামান্না নিয়ে সিন্ধুর পথে রওয়ানা করতে।[১০] আমি তখনও উদিত হচ্ছিলাম, যখন সিন্ধু-স্পেন-আফ্রিকা বিজেতা মুহাম্মদ-তারিক-মুসার প্রাণ ঝরলো ক্ষমতালোভী সোলায়মান আর সালিহর হাতে।[১১] আমি তখনও পৃথিবীকে আলোকিত করছিলাম, যখন নওজোয়ানদের

---

৭. মুসলমানদের হাতে একের পর এক পরাজয় বরণ করার পর রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে তাতেও তারা পরাজিত হয়। যুদ্ধটি হয় সিরিয়ার মাটিতে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এর নেতৃত্বে।

৮. রোম বিজয়ে যতগুলো যুদ্ধ মুসলমানদের করতে হয়েছিল, তার সবচেয়ে বড় যুদ্ধটি হয়েছিল আজনাদাইনের প্রান্তরে। এ অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমর ইবনুল আস (রা.)।

৯. খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে মুসলমানরা একই সাথে চারটি ময়দানে লড়ছিল। কুতায়বা ইবনে মুসলিমের নেতৃত্বে তুর্কিস্তানে, মুসা ইবনে নুসাইরের নেতৃত্বে আফ্রিকায়, তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে স্পেনে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুতে।

১০. হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরামর্শে সিন্ধু অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা খুবই কম। ঘটনাক্রমে তখন ছিল সামরিক প্রদর্শনীর একটি অনুষ্ঠান। তাতে খলীফার ভাই সোলায়মানকে বর্শার লড়াইয়ে পরাজিত করেন তরুণ মুহাম্মদ বিন কাসিম। তার বীরত্ব দেখে হাজারো যুবক তার অধীনে লড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

১১. খলীফা ওয়ালিদের ইন্তেকালের পর খলীফা হন তার ছোট ভাই সোলায়মান। কিন্তু তিনি ছিলেন হিংসুক ও ক্ষমতালোভী। জনপ্রিয়তা হারানোর ক্ষোভ তাকে হিংস্র করে তোলে। শুধুমাত্র এ কারণেই তিনি সিন্ধু বিজেতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে মৃত্যুদণ্ড দেন, তুর্কিস্তান বিজেতা কুতায়বা ইবনে মুসলিম ও আফ্রিকা বিজেতা মুসা ইবনে নুসাইরকে কারাবন্দী করেন আর স্পেন বিজেতা তারিক বিন যিয়াদকে করেন দেশান্তরিত। ক্ষমতালোভীদের হাতে খেলাফত ধ্বংসের সূচনা তার হাত ধরেই। তার এ সকল কাজের অন্যতম সহযোগী ছিল সালিহ।

তরবারি সেই বীরদের বিরহ সইতে না পেরে পান করলো সালিহর রক্ত[১২]।

আমি তখনও উদিত হচ্ছিলাম, যখন উমর বিন আব্দুল আজিজ লিখলেন নতুন ইতিহাস। আমি তখনও উদীয়মান ছিলাম, যখন হাসান ইবনে সাবাহর[১৩] ফেদায়ীরা নির্বংশ করে চলেছিল সেলজুকিদের। আমি তখনও উদীয়মান ছিলাম, যখন শিয়াদের হাতে রক্ত-রঞ্জিত হলো আবে-জমজম। আমি শত ব্যাথা নিয়ে তখনও পৃথিবীকে আলোকিত করছি, যখন গৃহযুদ্ধের কবলে শামের পবিত্র ভূমিতে ঝরছে শিশুদের রক্ত।[১৪] সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আজ অবধি যার নির্দেশে আমি তোমাদের আলো দান করছি, আজও তার হুকুমেই শত ব্যাথা নিয়ে আমি উদিত হচ্ছি, অন্যথায় আমার তেজ অন্যভাবে প্রকাশ পেত।"

এটা সে সময়ের কথা, যখন মালিক শাহ[১৫] আর নিযামুল মুলকের[১৬] বীরত্ব

---

১২. সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক শেষ মুহূর্তে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পরোয়ানা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু সালিহ ততক্ষণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে ফেলেছেন। এটা জানাজানি হওয়ার পর কিছু নওজোয়ান উত্তেজনার বশে সালিহর উপর একযোগে আক্রমণ করে বসে। সালিহ সেখানেই মারা যান। ঘটনাটি ঘটে মুহাম্মদ বিন কাসিমের জানাজার পরপরই।

১৩. ঈসমাইলী শিয়া সম্প্রদায়ের একজন ব্যক্তি। নিজের মতবাদের দুই গুরু মালিক ইবনে আতাশ ও আহমদ ইবনে গুতাশের কাছে যাদুবিদ্যার দীক্ষালাভ করে। সে যাদুবিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তার অনুসারীদের নিয়ে একটি গুপ্তঘাতক দল তৈরি করে। তার মূল কার্যক্রম ছিল, যাদুবিদ্যার দ্বারা তৈরি বিশেষ নেশাজাতীয় দ্রব্য 'হাশীশ' ব্যবহার করে মানুষকে তার বশে আনা, তাদেরকে নিজের অনুগত করা আর তাদের দিয়ে শীর্ষস্থানীয় সুন্নী ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা। সে সেলজুকি শাসনামলের উজিরে আজম 'নিজামুল মুলক', সিপাহসালার এবং অসংখ্যা আলেমকে তার লোক দিয়ে গুপ্ত হত্যা করায়। তার অনুগত লোকেরা তাকে নবীর মতো ভক্তি করতো। এ ছিল তার হাশীশের প্রভাব। ফলে এ বাহিনী ইতিহাসে 'হাশাশীন' নামে পরিচিতি লাভ করে। এবং এখান থেকে উৎপন্ন হয় ইংরেজী শব্দ Assassin. হাশাশীনদের সর্বোচ্চ পদমর্যাদা ছিল 'ফেদায়ী'। দুঃখের বিষয়, বর্তমান সমাজ শুধু গুপ্তঘাতক হিসেবেই তাদের ইতিহাস জানে, এ অনুভূতি আজ হারিয়ে গেছে যে, তারাই আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘাতক।

১৪. সিরিয়ার সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত।

১৫. সেলজুকি সালতানাতের একজন সুলতান। সেলজুক রাজবংশের পুরো ইতিহাসই ইসলামের ইতিহাসের অংশ নয়। বরং তারা ছিল একটি যোদ্ধা জাতি। তৎকালীন তুর্কি রাজদরবারের কর্মকর্তা সেলজুক ইবনে একায়েকের বংশই সেলজুকি নামে পরিচিত। তারা ইসলামের সংস্পর্শে আসার পর ইরাক ও তার আশপাশের অঞ্চলে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখার দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

১৬. নিযামুল মূলকের প্রকৃত নাম হাসান তুসী। নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন। তৎকালীন

গাঁথা বইয়ের পাতাতেও স্থান পায়নি। যখন হাশীশের নেশার ঘোরে বাগদাদের খেলাফত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে যাওয়ার ইতিহাস অতিক্রম করেছে প্রায় সহস্র বৎসর।

এটা সে সময়ের কথা, যখন কায়রো থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতিটি ধূলিকণা সালাহউদ্দীন[১৭] আর নুরুদ্দীনের[১৮] স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। যখন ফিলিস্তিনের কোন শিশু জাতির বিবেকদের উপর অভিমান নিয়ে বেঁচে আছে, কারণ তার অভিমান দূর করার কেউ নেই। যখন মিশরের মরুপ্রান্তরে পিরামিডের কোলে প্রমোদ ভ্রমণে আসা হাজারো লোকের মাঝে কোন আশাহত খুঁজে ফিরছে মরীচিকাকে, যে অন্তত কল্পনায় হলেও একবার তাকে সালাহউদ্দীনের ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শোনাবে। এটা সে সময়ের কথা, যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের মাটি ইহুদীদের বলছে-

"আমি তখনও তোমাদের বহন করেছি, যখন তোমরা বিজয়ের আনন্দে হত্যাযজ্ঞের উৎসব করেছিলে।[১৯] আমি তখনও তোমাদের বহন করেছি, যখন বিজয়োৎসবে তোমরা মুসলমানদের গোশ্ত খাওয়ার সাহস দেখিয়েছ। আমি তখনও তোমাদের বহন করেছি, যখন শেখ সান্নানের[২০] ঘাতক দল দিয়ে তোমরা আইউবীকে হত্যার অপচেষ্টা করেছ। আমি তখনও তোমাদের বহন

প্রখ্যাত আলেম ইমাম মুওয়াফিকের নিকট হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে মালিক শাহের শাসনামলে সেলজুকি সালতানাতের উজির হন। তার শাসনকার্যের দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে সে যুগের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই তাকে নিযামুল মূলক উপাধিতে ভূষিত করেন। ইরানের বিখ্যাত কবি ওমর খৈয়াম তার সহপাঠী ছিলেন।

১৭. সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী। ফিলিস্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাস বিজেতা। ১১৭১ সালে মিশরের সেনা গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। প্রায় বিশ বছরের কঠিন সংগ্রামের পর বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাঙ্গন থেকে খ্রিষ্টানদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। ১১৯১ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় হয়। তিনি ১১৯৪ সালে ইন্তেকাল করেন।

১৮. নুরউদ্দীন আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে ইমাদউদ্দীন জঙ্গী (১১১৮-১১৭৪) ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত জঙ্গী রাজবংশীয় শাসক। ১১৪৬ থেকে ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেলজুক সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশ শাসন করেছেন। সুলতান সালাহউদ্দীনকে তিনিই মিশরের গভর্ণরের দায়িত্ব দেন এবং আমৃত্যু তার সকল সংগ্রামে পাশে থাকেন।

১৯. খ্রিষ্টানরা সম্রাট গডফ্রের নেতৃত্বে ১০৯৯ সালে বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে। এ সময় বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রান্তরে তিন দিনে প্রায় ৭০,০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয়। এ সময় তারা বিজয় উৎসবে স্বাস্থ্যবান যুবকদের হত্যা করে তাদের গোশ্ত খেয়েছে। বলা হয়ে থাকে, সে সময় মুকাদ্দাসের প্রান্তরে ঘোড়ার হাটু পর্যন্ত রক্ত জমে গিয়েছিল।

২০. হাসান ইবনে সাবাহর উত্তরসূরিদের একজন।

করেছি, যখন তোমরা নারীর ফাঁদ দিয়ে মুসলমানদের পথ আটকানোর চেষ্টা করেছ। আমি তখনও তোমাদের বহন করেছি, যখন তোমাদের গুপ্তঘাতক দল নুরুদ্দীনকে শাহাদতের দরজায় পাঠিয়ে দিল।[২১] আমি তখনও তোমাদের বহন করেছি, যখন বিজয়ী সালাহউদ্দীন তোমাদের সাথে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তোমাদের সম্রাটকে ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল। আমি তখনও তোমাদের বহন করছি, যখন সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করে তোমরা পবিত্র ভূমিকে নিজেদের ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়েছ।[২২] মনে রেখ, আমি তাদের রক্ত পান করেছি, যারা খোদার রাহে একবার ঘোড়া ছুটিয়ে পেছন ফিরে তাকায়নি, যারা বিদায়ের পূর্বে প্রেয়সীর অশ্রুসজল চোখের দিকে তাকিয়ে "দেখা হবে জান্নাতে" বলে ঘোড়া ছুটিয়েছে। সেদিন আমার বুকে দাঁড়িয়ে আইউবী যদি তোমাদের ক্ষমা না করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতো, তাহলে খোদার কসম আমি তোমাদের গ্রাস করে নিতাম, নাজমুদ্দীন আর সুফিয়ানের পুত্রদের[২৩] ক্ষমার গুণ নিয়ে আমি আজও তোমাদের বহন করে চলেছি, আর অপেক্ষায় আছি, কবে মুসলমান চুড়ি খুলে অস্ত্র হাতে নিবে।"

এটা সে সময়ের কথা, যখন বাগদাদের আকাশ-বাতাস তাতারীদের হত্যাযজ্ঞের স্মৃতি ভুলতে পারেনি। যখন মাটি তাদের হাতে ঝরা মুসলমানদের রক্ত পান করতে শেষ করতে পারেনি। কারণ, এখানে কাব্যের চর্চা হয়েছে, সুরের তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েছে আত্মভোলা হৃদয়। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে হাজারো পৃষ্ঠা কাগজের অপচয় হয়েছে। এখানকার মাটি কবির কলমের কালির গন্ধ মনে রাখতে চায়নি। এখানে কেউ বলেনি- "কলমের কালি আর চোখের অশ্রুতে নিজেদের ইতিহাসের কলঙ্ক মোচন সম্ভব নয়, বুকের রক্তে নতুন ইতিহাস রচনা করো।" তাই বাগদাদের মাটিতে আজও রক্তের গন্ধ।

এটা সে সময়ের কথা, যখন গোয়াদেল কুইভারের[২৪] স্রোত আন্দালুসের সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাসের পালাবদলের সাক্ষী। যখন জাতির কোন অভিমানী যুবক সে স্রোতের গতিপথের দৃশ্য দেখে স্মৃতির সাগরে সুখের মুক্তা হারিয়ে খুঁজছে। এটা সে সময়ের কথা, যখন কেউ উদাস মনে চাঁদের দিকে

---

২১. সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী গুপ্তঘাতকদের মেশানো বিষযুক্ত খাবার খেয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

২২. সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত।

২৩. এখানে সালাহউদ্দীন বিন নাজমুদ্দীন আইউবী ও আলী বিন সুফিয়ান উদ্দেশ্য।

২৪. স্পেনের একটি নদী। কর্ডোভা এই নদীর তীরেই অবস্থিত।

তাকিয়ে খুঁজছে তার প্রেমাস্পদের চাহনির চিহ্ন আর চাঁদ তাকে বলছে এমন কিছু, যা সে শুনছে না। হয়ত বলছে-

"আমি সেদিনও উদিত হয়েছিলাম, যেদিন তোমাদের পূর্বপুরুষদের হৃদয়ে ঝড় তুলে এ ভূমিতে অবতরণ করেছিল জাহাজ পোড়ানো তারিক।[২৫] আমি তখনও উদিত হয়েছিলাম, যখন মদীনাতুজ জোহরার[২৬] রক্ষীরা স্পেন পেরিয়ে ফ্রান্সের রাজফটকে আঘাত হানার জন্য তরবারিতে শান দিচ্ছিল, আর তোমাদের শাসক সমাজ কাব্যের ছন্দে নিজেদের জড়িয়ে মিথ্যা সুখ খুঁজছিল। আমি তখনও উদিত হয়েছিলাম, যখন তাশফীনের পুত্র[২৭] সাগর পাড়ি দিয়ে জীবন্মৃত আন্দালুসকে বাঁচানোর জন্য এসে হিসনুল্লায়েতের প্রান্তরে আলফানসুর পলায়নের কারণ হয়েছিল। আমি তখনও উদিত হয়েছিলাম, যখন আবু আবদুল্লাহর[২৮] বিশ্বাসঘাতকতা আলহামরার দরজা খুলে দিল ফার্ডিনান্ড আর ইসাবেলার প্রমোদের জন্য। আমি তখনও উদিত হয়েছিলাম, যখন তোমাদের ভূমিতে এপ্রিলের প্রথম দিনে মসজিদের অভ্যন্তরে তারা মুসলমানদের 'নিরাপত্তা' দিচ্ছিল।[২৯] আমি আজও উদিত হচ্ছি, যখন তোমরা বসে আছো পৃথিবীর অন্যতম নগ্নতা চর্চা-কেন্দ্রে আর আমার মাঝে খুঁজে ফিরছো কারো চাহনি, যার সৌন্দর্য্য আমার কথাগুলো তোমাকে শুনতে দিচ্ছে না।"

এটা সে সময়ের কথা, যখন হিন্দুস্তানের মাটি সহস্রাধিক বৎসরের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার শেষ চেষ্টা করছে। যখন মুহাম্মদ বিন কাসিমের

---

২৫. স্পেন বিজয়ের জন্য এসে সমুদ্র তীরে নামার পর সবগুলো জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তারিক বিন যিয়াদ।

২৬. তৎকালীন কর্ডোভার শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমান কর্তৃক নির্মিত সুবিশাল রাজপ্রাসাদ। যার প্রবেশ দরজার সংখ্যা ছিল পনের হাজার, এতে ছিল সাড়ে নয়শত হাম্মামখানা ও ষোলটি মনোরম বাগান। এই মহলের রক্ষী ও এতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় পচিশ হাজার।

২৭. ইউসুফ বিন তাশফীন, মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। তিনি মরক্কো থেকে আলজেরিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ এলাকা মুসলমানদের অধীনে নিয়ে আসেন। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে স্পেন যখন খন্ড খন্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তাদের বিভক্তির সুযোগ নিয়ে খ্রিষ্টান সম্রাট ষষ্ঠ আলফানসু স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করতে থাকে। এক পর্যায়ে স্পেনের সচেতন মুসলমানরা একজোট হয়ে ইউসুফ বিন তাশফীনকে অনুরোধ করেন, স্পেনে এসে আলফানসুর বিপক্ষে যুদ্ধে তাদেরকে নেতৃত্ব দিতে। তারই প্রেক্ষিতে তিনি স্পেনে আসেন এবং হিসনুল্লায়েত নামক জায়গায় আলফানসুকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করেন।

২৮. গ্রানাডার শেষ শাসক। আলহামরা ছিল তৎকালীন গ্রানাডার রাজপ্রাসাদ।

২৯. এপ্রিল ফুলের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।

উত্তরসূরিরা জানেনা ইতিহাস কি! এটা সে সময়ের কথা, যখন পদ্মা-ভাগিরথীর তীরে বসে কেউ খোশগল্পে মজে আছে অথচ প্রবাহমান জল তাকে চিৎকার করে এমন অনেক কিছুই বলছে যা শোনার যোগ্যতা তার নেই-

"আমি তখনও প্রবাহিত হতাম, যখন নির্যাতিতা মেয়ের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে হজ্জাজের জামাতা সিন্ধুর বুকে বজ্রাঘাত হানলো। আমি তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন কাসিমের পুত্রের 'আরুস'[৩০] দাহিরের রাজপ্রাসাদে ফাটল ধরাল। আমি তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন বখতিয়ারের ঘোড়ার আওয়াজে লক্ষণসেন পলায়ন করলো।[৩১] আমি তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন মাহমুদের তরবারির আঘাতে ঝরা রক্ত পান করে দেবতাগুলো শেষ বিদায় নিল। আমি তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন পৃথ্বীরাজের রক্ত শোভা পাচ্ছিল হাম্মাদের[৩২] তরবারির ডগায়। আমি তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন দিল্লী-মুর্শিদাবাদ রাজপথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিটি বৃক্ষ ছিল লাশের আশ্রয়স্থল।[৩৩] আমি এখনো প্রবাহিত হচ্ছি, যখন এ মাটি প্রস্তুতি নিচ্ছে গাযওয়ায়ে হিন্দের।"

এরকম একটি সময়ে একজন আত্মাভিমানী মুসলিম যুবক জানার চেষ্টা করছে তার জাতির পতনের আসল কারণ। তার মনের গভীরে তৈরি হওয়া প্রশ্নগুলো ধাপে ধাপে সামনে আসছে, আর উত্তরের জন্য আশ্রয় নিচ্ছে নিজের চিন্তাশক্তির। না, শুধু নিজের চিন্তার জোড়ে নয়, তার সামনে উত্তরগুলো ধরা দিচ্ছে বিভিন্ন সময়ে অধ্যয়ন করা জ্ঞানী ব্যক্তিদের লেখনী, জ্ঞানীদের সাহচর্যে থেকে শোনা নানা কথা, আর জীবন চলার পথে পথসঙ্গী হওয়া ব্যক্তিদের থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে।

---

৩০. বিশেষ ধরণের মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপক কামান)। মুহাম্মদ বিন কাসিমের উদ্ভাবিত এ কামানটি অনেক বড় ছিল। ফলে ভারী ভারী পাথর অনেক দূরে নিক্ষেপ করা যেত। এটা বহন করার জন্য বিশাল একটি বহরের প্রয়োজন হত। ফলে এর নাম দেয়া হয়েছিল 'আরুস' (বিয়ের কনে)।

৩১. ১২০৪ সালে ১৭ জন সৈনিক নিয়ে বাংলার মাটিতে বখতিয়ার খিলজির আগমনের ঘটনা। যার আগমনের সংবাদ শুনেই লক্ষনসেন গোপনে নৌপথে পালিয়ে যায়।

৩২. তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মুহাম্মদ ঘুরীর হাতে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে হত্যাকারী সৈনিকের নাম হাম্মাদ বিন খালদুন।

৩৩. ইংরেজদের সময়ে হিন্দুস্তানের আলেম সমাজের উপর হওয়া নির্মম হত্যাযজ্ঞের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।

আমাদের সমস্যা কোথায়?

আমাদের মূল শক্তি কি ছিল?

আবার কবে আমাদের পক্ষে জেগে উঠা সম্ভব?

কিভাবে?....

প্রথম প্রশ্ন: আমাদের সমস্যা কোথায়?

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা কি?

সমস্যার কথা বলতে গেলে শেষ হবে না। ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন চলছে স্বেচ্ছাচারিতা, তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও চলছে ক্ষমতার অপব্যবহার। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রেই পদে পদে বাড়ছে মানুষের অপরাধ প্রবণতা। অর্থব্যবস্থাকে যে যার মতো করে নিয়ন্ত্রণ করার অপচেষ্টায় মেতেছে। প্রতিটি জিনিসের যদি দুটি দিক কল্পনা করি, যার একটি ইতিবাচক ও উপকারী, অপরটি নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক, আর দ্বিতীয়টি সদা প্রথমটিকে ধংস করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে, তাহলে মানবসভ্যতার সেই দুটি দিক হচ্ছে অর্থনীতি আর অপরাধ। অর্থনীতিকে ঘিরেই যত অপরাধ।

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আমরা অপরাধ জগতের বাসিন্দা। প্রতিটি মানুষের ভিতরেই ভাল ও মন্দ দুটি দিক রয়েছে। একজন ভালো মানুষও মন্দ দিকটি থেকে মুক্ত নন। তেমনি আমরা সভ্য সমাজের সভ্য মানুষও অপরাধ থেকে মুক্ত নই। হয় অপরাধী, নয়তো অপরাধের শিকার। অবশ্য দুটোর যুগোপৎ-ই বেশি ঘটে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা একইসাথে অপরাধী ও অপরাধের শিকার। অপরাধ দমনের প্রয়োজনীয়তা আমরা সকলেই জানি এবং বুঝি, কিন্তু তাতে অপরাধ দমন হয় না। কারণ অপরাধ দমনের ইচ্ছা কারো নেই। এই জায়গাটাতে আমরা ভালো মানুষরা আরো বড় অপরাধী।

সকল অপরাধকে বিশ্লেষণ করলে নৈতিকতার অবক্ষয়, মানবতাবোধের অভাব, মনুষ্যত্বহীনতা- এ শব্দগুলোই উঠে আসবে। সমস্যা মূলত এগুলোই। আমরা মানুষ হয়েও মনুষ্যত্বহীন। মানবতাবোধের অভাবই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

জাহিলিয়াতের যুগে রাসূল (সা.) এর আগমন মানবতাকে দেখায় নতুন দিশা। যার প্রভাব কালের পরিক্রমায় ছড়িয়ে পড়ে আরব উপদ্বীপের সীমানা পেরিয়ে গোটা বিশ্বে। তবে সে প্রভাব চিরস্থায়ী হয়নি। পৃথিবীর এক অমোঘ নিয়ম- "পূর্ণ জিনিসের পূর্ণতা কখনো চিরস্থায়ী হয় না"- অনুসরণ করে সে প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। রাসূল (সা.) এর আদর্শ তাই আর সে যুগের মতো নেই। সে ইতিহাস বইয়ের পাতায় জ্বলজ্বল করছে ঠিকই, কিন্তু সে ঝলকানির প্রতিফলন কোথাও নেই। কেন? সমস্যা কোথায়?

মানবতা নামক জিনিসটির চর্চা মানুষের মাঝে আজ নেই। শিক্ষা মানুষকে 'মানুষ' করতে ব্যর্থ। শিক্ষকের শিক্ষাদান ছাত্রকে, সাহিত্যিকের লেখনী পাঠককে, বক্তৃতার জ্বালাময়ী ভাষা শ্রোতাকে, শাসকদের শাসন জনগণকে মানবতা শেখাতে ব্যর্থ। মানবতার কথা যারা উঁচু গলায় বলেন, তাদের বলার দ্বারা মানবতার কিছু হয় না, কারণ তারা নিজেরাই সেটা চান না। শোষকদের হাতে শোষিতদের অবস্থা দেখে যাদের কথার ফুলঝুরি ছোটে, তারা স্বয়ং শোষকদের চেয়ে ভিন্ন কিছু নন, তাদের কথা দৃষ্টি আকর্ষণের অন্য একটি অস্ত্র মাত্র।

শিক্ষকের শিক্ষাদান ছাত্রকে রুজি রোজগারের পথ দেখাচ্ছে মাত্র, মানবতার উন্নতি তাতে হচ্ছে না। কারণ শিক্ষক স্বয়ং চান না, তার ছাত্র মানবতা শিখুক। ছাত্র ভালো চাকুরি করতে পারলে সেটা তার পরম গর্বের বিষয়, সেটা হোক না অমানবিক পন্থায়! রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হিংস্র প্রাণীরও হয়ে থাকে, সেটা যে পন্থায়ই হোক। নিজের পেট চালানো অশিক্ষিত ব্যক্তিও জানে, সেটা যেভাবেই হোক। শিক্ষকের শিক্ষাদান ছাত্রকে রোজগার শেখাচ্ছে হয়ত একটু উন্নত পন্থায় বটে, কাজের দিক থেকে তা অশিক্ষিত ব্যক্তি কিংবা হিংস্র প্রাণীর চেয়ে খুব বেশি কিছু নয়। ছাত্রকে মানবিক না হতে দেয়ার দায় তারা নেবেন না। কারণ তারা এভাবেই শিক্ষালাভ করে এ স্থানে এসেছেন। অন্যথায় মানবতা আজ ভিন্নরূপ দেখত।

সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনা মানুষের মনকে জাগাতে ব্যর্থ। তাদের লেখনীর কারুকার্য পাঠকগণ মন দিয়ে উপভোগ করেন, কিন্তু তাতে উপকার হয় সামান্যই। তাদের ক্ষুরধার লেখনীর ধারে পাঠকের মনে দাগ সৃষ্টি হচ্ছে বটে, সে দাগ মানবতার জন্য ব্যথা জাগাতে ব্যর্থ।

বক্তৃতার মঞ্চে মানবতার জন্য যারা বক্তব্য দেন, তাদের কথার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে রবি ঠাকুরের কথা স্মরণ করতে হয়, "আমরা উন্নয়নের পালে হাওয়া দিচ্ছি, কিন্তু গাল যতখানি ফুলিতেছে, পাল ততখানি ফুলিতেছে

না।" মানুষের অন্তরে মানবতা জাগাতে নয়, কথার রং মাখানো হয় নিজেকে মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইসলাম মানবতার মুক্তি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসেনি। ইসলামকে না বুঝা মানবতার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা।

শিক্ষকের শিক্ষাদান, লেখকের লেখনী, বক্তার বক্তব্য, মানবতাবাদীদের বড় বড় কথা কোন কিছুই মানবতার উপকারে আসছেনা। এসবের কারণ যদি ইসলামকে না বুঝা হয়, তাহলে ইসলাম যতটুকু টিকে আছে অন্তত ততটুকু মানবতা তো থাকা উচিত। সেটা কোথায়? মুসলমানের মধ্য থেকেও মানবতা বিদায় নিয়েছে, স্থুল দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি কি ভুল হবে?

না ভুল নয়, তবে উত্তর আগেরটাই। ইসলামকে না জানাটাই মূল কারণ। যে মুসলমান নিজেই ইসলামকে জানে না, তার কাছে মানবতা আশা করা যায় না। ইসলামকে বুঝা বলতে শুধু ইসলামের পরিচয় জানা নয়। বুঝার দাবী হচ্ছে পূর্ণরূপে মানা। কোন ব্যক্তি যা বুঝবে তা যদি না মানে, তবে সে তা বুঝে নি।

ইসলামকে না জানাটাই কেন একমাত্র কারণ হবে?

কারণ, দ্বিতীয় কোন সমাধান মানবতার জন্য নেই। সত্য একটাই হয়, অনেক নয়। সত্যের বাইরে সবই মিথ্যা।[৩৪] আলোর বাইরে সবই অন্ধকার।

---

৩৪. আল্লাহ তায়ালার বাণী- **فماذا بعد الحق إلا الضلال** (সত্যের পরে মিথ্যা ছাড়া আর কি থাকতে পারে?)

অতীতে মুসলমানদের উন্নতির মূল শক্তি কি ছিল?

তাহলে অতীতে মুসলমানদের উন্নতির মূল শক্তি কি ছিল? অতীত বলতে কোন সময় তা আশা করি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

মানবতাবোধ। এটাই ছিল তাদের শক্তি। তারা নিজেদের সাথে যেমন অমানবিকতার আশ্রয় নেয়নি, যুদ্ধে বিজিত শত্রুদের সাথেও তেমন অমানবিক আচারণ করে নি। এ শক্তিই তাদেরকে জয় এনে দিয়েছে প্রতিটি ময়দানে। এ শক্তির বলে তারা জয় করেছে মানুষের হৃদয়।

তাহলে তাদের পতন কিভাবে ঘটল?

নিজেদের মধ্য থেকে মানবতাবোধ বিদায় নেয়ার কারণেই। যেদিন থেকে তাদের মানবতাবোধে ফাটল সৃষ্টি হল, তাতে জায়গা করে নিল লোভ, হিংসা, ক্ষমতার লড়াই, যেগুলো তাদের মধ্যে ছিল না, থাকার কথাও ছিল না। ফলে কায়সার-কিসরাদের ক্ষমতার লড়াইয়ের নির্লজ্জ পুনরাবৃত্তি মুসলমানদের হাতে ঘটতে থাকলো।

কেন মানবতাবোধে ফাটল ধরলো? প্রবৃত্তিকে দমন করার শিক্ষা কি ইসলাম দেয় নি? তাদের লোভ, হিংসা, বিলাসিতা থেকে বাঁচার কোন উপায় কি ছিল না? ইসলামের মধ্যে থেকে কি করে তারা এভাবে প্রবৃত্তির দাস হলো? যারা প্রবৃত্তির পূজারী হয়ে যায় নি, তাদের শক্তি কি ছিল?

ঈমানী শক্তি বা ইসলামী চেতনাবোধই ছিল ছিল তাদের আসল শক্তি, আর এটা না থাকাই পরবর্তীদের পতনের কারণ।

ঈমানী শক্তির মূল কোথায়? তার অভাবই বা তৈরি হলো কিভাবে?

এর উত্তর হচ্ছে 'জ্ঞান'। জ্ঞানই ঈমানী শক্তির মূল, জ্ঞানের অভাবই ঈমান হরণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু জ্ঞান-ই কেন? কিভাবে? -এর উত্তরের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের সাথে পরিচয় হওয়া। সে-ই আমাদেরকে উত্তর দিতে সাহায্য করবে।

জ্ঞানের সাথে পরিচয়

জ্ঞান কি?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারবে না। কারণ, জ্ঞান মহান আল্লাহর একটি গুণ। তার গুণ অসীম। অসীমকে সসীমের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অসীম গুণের খুব সামান্যই আমাদের দান করা হয়েছে। জ্ঞানের কোন পরিচয় বা সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, জ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে হবে জ্ঞানের দ্বারাই। উৎস আর প্রাপ্ত জিনিস যদি একই হয়, তাহলে প্রাপ্ত জিনিস অর্থহীন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন সসীম জ্ঞানের উপযোগী ভাষায়। তা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের সংজ্ঞা নয়, সংজ্ঞাদানকারীদের জ্ঞানের প্রকাশমাত্র। অসীম সত্তাকে চিনতে হয় সসীম জগতে তার প্রকাশিত গুণাবলি দিয়ে, সসীম মানুষকে তার দেয়া সসীম জ্ঞান দিয়ে। আর অসীম জ্ঞানকে চিনতে হয় সসীম জগতে তার শক্তির প্রকাশকে উপলব্ধি করে। জ্ঞানের শক্তি যেখানে অপ্রকাশিত, অথবা প্রকাশিত শক্তিকে কেউ দেখার যোগ্যতা রাখে না, সেখানে জ্ঞানের পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়।

কোন কিছু জানাকেই আমরা জ্ঞান বলতে পারি না। তাহলে অনেক কিছু জানা সত্ত্বেও যারা মনুষ্যত্বহীন, তাদেরকে জ্ঞানীদের সারিতে দাঁড় করাতে হয়, সেটা স্বয়ং 'জ্ঞান' অনুমতি দিবে না, বিনা অনুমতিতে করলে সহ্যও করবে না। বই অধ্যয়ন করে কণ্ঠস্থ করার নাম জ্ঞান নয়, স্মরনশক্তি। কোন কিছু জানার নাম জ্ঞান নয়, বরং মগজকে জানার ধারণ ক্ষমতা যে তৈরি করে দেয়, তার নাম জ্ঞান। যা জানা হয় তা জ্ঞান নয়, যা দ্বারা জানা হয় জ্ঞান সেটাই। কথা বা লেখার মোড়কে বাঁধা প্রকাশিত সত্যকে জানার নাম জ্ঞান নয়, জানা জিনিসের সার-নির্যাস থেকে সত্যকে যার দ্বারা উদঘাটন করা যায়, তার নাম জ্ঞান। ইতিহাসকে যারা অধ্যয়ন করেন, জানেন, তাদেরকে ঐতিহাসিক কিংবা আর যাই বলা হোক, জ্ঞানী বলা হবে তখনই, যখন জানা ইতিহাসের দ্বারা অজানা ইতিহাসের সত্যাসত্যের রহস্যভেদ করার ক্ষমতা অর্জন করবেন। জানাকে জ্ঞান বলা যাবে না, কারণ তা অপূর্ণ। জানা বিষয় যখন আরেকটি অজানার সন্ধান দিবে, তখন সেটি হবে জ্ঞান।

জ্ঞান বুঝার জিনিস, বুঝানোর জিনিস নয়।

এটা এমন এক বিস্তৃত মরু-প্রান্তর, যার সীমা দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা দিয়ে বুঝা সম্ভব, ভাষার কারুকার্য দিয়ে বুঝানো সম্ভব নয়। এটা এমন এক গভীর মহাসাগর, যার গভীরতা তার মাঝে হারিয়ে গিয়ে নিজের অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা দিয়ে বুঝা সম্ভব, তার তীরে দাঁড়িয়ে কথার অলংকারে বুঝানো সম্ভব নয়। এটা এমন এক সুউচ্চ পর্বতমালা, যার উচ্চতা তাকে জয় করতে গিয়ে পথহারা হওয়ার মাধ্যমে বুঝা সম্ভব, তার সামনে দাঁড়িয়ে লেখনীর পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বুঝানো সম্ভব নয়। এটা এমন এক সুবিশাল আসমান, যার বিশালতা মুক্ত বিহঙ্গের মতো বিচরণ করার দ্বারা বুঝা সম্ভব, কাব্যের ছন্দে বুঝানো সম্ভব নয়। এটা এমন এক গহীন অরণ্য, যার গহীনতা তার মাঝে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলার দ্বারা বুঝা সম্ভব, কথার রঙ চড়িয়ে তার সবুজ পত্র-পল্লবের বিবরণের মাধ্যমে বুঝানো সম্ভব নয়।

জ্ঞানকে বুঝতে হয় তার মাঝে হারিয়ে গিয়ে। আজ পর্যন্ত কতজন হারিয়ে গেছে, কেউ জানে না।

জ্ঞানের স্তরভেদ

জ্ঞানের স্তর কয়টি? জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তি- "জ্ঞানের তিনটি স্তর -প্রথম স্তরে আরোহণকারী হয় অহংকারী, দ্বিতীয় স্তরে হয় বিনয়ী, আর তৃতীয় স্তরে নিজের অজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে"- কথাটির দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপ কিভাবে প্রকাশ পায়?

জ্ঞানের কোন স্তর নেই। কথাটির দ্বারা জ্ঞানের স্তর উদ্দেশ্য নয়, জ্ঞান আহরণকারীদের স্তর উদ্দেশ্য।

এটা এমন সাগর যার গভীরতার কোন স্তর নেই। স্তর আছে তাতে মুক্তা আহরণকারীর। যে প্রথম স্তরে থাকে সাগরের ধনশ্বৈর্য্যকে নিজের করে নেয়ার হীন ইচ্ছা লালনকারী লোভী, দ্বিতীয় স্তরে হয়ে যায় সে ঐশ্বর্য্যের পূজারী, আর তৃতীয় স্তরে তার বিশালতার মাঝে নিজের নিঃস্বতা অনুভব করে লাভ করে এক অদ্ভুত তৃপ্তি।

এটা এমন সুবিশাল আসমান, যার বিশালতার স্তরভেদ কল্পনা করা যায় না। স্তর হয় তাতে বিচরণকারী মুক্ত বিহঙ্গের। যে প্রথম স্তরে থাকে নিজের শূন্যে বিচরণের ক্ষমতায় আত্ম-অহংকারী, দ্বিতীয় স্তরে ডানার অসারতা তাকে করে তোলে বিনয়ী, আর তৃতীয় স্তরে আর তৃতীয় স্তরে ক্ষমতার শেষ সীমায় গিয়ে উপলব্ধি করে নিজের ক্ষুদ্রতা।

এটা এমন বিস্তৃত মরু-প্রান্তর, যার বিস্তৃতির কোন স্তর নেই। স্তর রয়েছে এতে জীবন বাজি রেখে ছোটা মরুচারীর। যে প্রথম স্তরে থাকে মরুর উত্তাপকে জয় করার দর্পে অহংকারী, দ্বিতীয় স্তরে তৃষ্ণার কাছে হয়ে যায় বিনয়ী, আর তৃতীয় স্তরে মরীচিকার সাথে প্রাণপণ লড়াইয়ের পর আত্মাহুতি দেয়ার মুহূর্তে অনুভব করে নিজের অক্ষমতা।

এটা এমন প্রস্তরাকীর্ণ পর্বতমালা, যার দূর্গম পথের ভয়াবহতার কোন স্তর কল্পনা করা যায় না। স্তর হয়ে থাকে তাকে জয় করা আরোহীর। যে প্রথম স্তরে থাকে সুউচ্চে আরোহনের দম্ভে গর্বিত, দ্বিতীয় স্তরে ধারালো প্রস্তরখণ্ডের আঘাত যাকে বিনয়ী করে, আর তৃতীয় স্তরে সে ধারালো প্রস্তরের বুকে রক্তের দাগ রেখে অসীমের সীমায় হারিয়ে খুঁজে নেয় অনন্ত সুখ।

এটা এমন ধনভাণ্ডার, যার চাকচিক্যের কোন স্তরভেদ কল্পনা করা

অর্থহীন। স্তর হয় তাকে খুঁজে পেতে মরিয়া আহরণকারীর। যে প্রথম স্তরে থাকে কিছু স্বর্ণ খুঁজে পাওয়ার গর্বে গর্বিত, দ্বিতীয় স্তরে হীরকের ঝলকানি তাকে বিনয়ী হতে বাধ্য করে, আর তৃতীয় স্তরে মণি-মুক্তার চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের ভাণ্ডারের সামনে নিজের নিঃস্বতা উপলব্ধি করার মধ্যেই খুঁজে পায় আসল সুখ।

এটা এমন কাব্য, যার ছন্দের মাধুর্যের কোন স্তর নেই। স্তর আছে ছন্দের ঢেউয়ে নাও ভাসানো মাঝির। যে প্রথম স্তরে থাকে লোকের মনে ছন্দের মিষ্টতা তৈরি করার গর্বে গর্বিত, দ্বিতীয় স্তরে তার ছন্দ হয়ে যায় তার জন্য নিরহঙ্কার অনুভূতির অপূর্ব বহি:প্রকাশ, আর তৃতীয় স্তরে খুঁজে পায় ছন্দের সাগরে নিজেকে হারিয়ে ফেলার অপূর্ব আনন্দ।

এটা এমন পুষ্পকানন, যার সৌন্দর্যের কোন স্তর নেই। স্তর আছে তার সুবাস গ্রহনকারীর। যে প্রথম স্তরে থাকে ফুলের সৌন্দর্য হরণের অপচেষ্টায় লিপ্ত, দ্বিতীয় স্তরে সৌন্দর্যের মুগ্ধতা তাকে বিনয়ী হতে বাধ্য করে, আর তৃতীয় স্তরে সে হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের নিঃস্বার্থ লালনকারী।

একটি উদাহরণের দ্বারা জ্ঞানের স্তর সংক্রান্ত কথাগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। জ্ঞান যদি অথৈ সাগর হয়, আর জ্ঞান অন্বেষণকারী যদি একটি খালি কলস হয়, আর কলসটি যদি পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়, তাহলে উক্ত কথাগুলোর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ দাঁড়াবে-

প্রথমত, কলসটি ঢেউয়ের ধাক্কায় নড়তে শুরু করবে। এটা তার প্রথম অবস্থা। যখন সে জ্ঞানের সামান্য ছোয়া পেল। তার এই নড়াচড়া তার অহংকারের অবস্থাকে প্রকাশ করবে। দ্বিতীয়ত, একটা সময় ঢেউয়ের ধাক্কায় সে কাত হয়ে পড়ে যাবে, আর তার মধ্যে পানি ঢুকতে শুরু করবে। এসময়ে তার নড়াচড়া কমে যাবে। এটা তার বিনয়ের অবস্থা। জ্ঞান তার মধ্যে যত প্রবেশ করতে থাকবে, ততই তার বিনয় বাড়তে থাকবে। তৃতীয়ত, কলসটি ভর্তি হওয়ার পর সম্পূর্ণ ডুবে যাবে। তখন জ্ঞান সাগরের অসীম জলরাশির মধ্যে নিজে কে শূন্য মনে হবে। এটা তার সর্বশেষ অবস্থা যখন নিজের অজ্ঞতা, নিঃস্বতা, শূন্যতা আর অক্ষমতাকে অনুভব করার মাঝেই সে খুঁজে পাবে আসল তৃপ্তি। এগুলো জ্ঞানের স্তরভেদ নয়, জ্ঞান আহরণকারীর।

জ্ঞান বুঝার জিনিস, বুঝানোর জিনিস নয়- তাহলে তাকে বুঝার জন্য অন্তত কোন উপমার তো প্রয়োজন আছে। তা না হলে জ্ঞানকে পাবো কিভাবে?

উপমা হিসেবে জ্ঞানকে একটা রাজ্য ধরে নেয়া যাক। আর তার সৈন্য সামন্তের সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি, দেখি জ্ঞানকে চেনা যায় কি না।

জ্ঞানের রাজ্য

জ্ঞানের রাজ্য কেমন? সে রাজ্যের সৈন্য-সামন্ত কারা? কাদের দ্বারা জ্ঞান জ্ঞানীদেরকে পথ দেখায়? কাদের দ্বারা জ্ঞান তার রাজ্য পরিচালনা করে? এমন কি কেউ আছে, যাকে আশ্রয় করে জ্ঞান জ্ঞানীদের অন্তরে প্রবেশ করে? তারা যদি ভুল পথে যায় তখন জ্ঞানের কি হবে? আর জ্ঞানীরই বা কি হবে?

উত্তর হতে পারে, জ্ঞান তার রাজ্যে যাদেরকে সৈনিক হিসেবে ব্যাবহার করে তারা হলো দর্শন, চিন্তা, বিশ্বাস, সত্য, আলো এবং অন্ধকার। জ্ঞানই তাদেরকে পরিচালনা করে, আবার জ্ঞানকে পেতে হবে তাদের দ্বারাই। বাদশাহ সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দেশ বিজয় করেন, বিজিতদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, তাদেরকে শাসন করেন আবার বাদশাহকে পেতে হলে আগে প্রয়োজন সৈনিকদের জয় করা। এরা কেউ বিগড়ে গেলে বাদশাহর কাছে পৌঁছানো অসম্ভব। বিষয়গুলো বিক্ষিপ্ত মনে হতে পারে, কিন্তু আদতে তা নয়। সবগুলো একই সূত্রে গাঁথা। বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে সুতা বাঁধতে না জানলে। মালা গাঁথতে জানা ব্যক্তিরাই জানেন মুক্তার সাথে সুতার সম্পর্ক। মুক্তা আহরণকারীর সাথে চরকায় সুতা কাটা ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই।

দর্শন ছাড়া জানা পূর্ণতা পায়না, চিন্তা ছাড়া দর্শন অন্ধ, দর্শন আর চিন্তার সঠিক সমন্বয়ে আসে বিশ্বাস, বিশ্বাস চেনায় সত্যকে, সত্যের রূপ আলোর ন্যায় উদ্ভাসিত, এর বাইরে যা আছে সবই অন্ধকার।

জ্ঞানকে ভাষার দ্বারা পরিচয় করিয়ে দেয়া সম্ভব নয়, তবে তার সৈনিকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে। সৈনিকদের পরিচয় জানলে বাদশাহকে চেনা যাবে। তবে সেটা হবে রূপক। বাদশাহ আর সৈনিকের স্তর এক নয়। সৈনিকরা বাদশাহর পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করে মাত্র। কারণ এখানে বাদশাহ অসীম সত্তা, সৈনিকরা সসীম। আল্লাহ তায়ালা অসীম, ফেরেশতাগণ সসীম। অথচ ফেরেশতাগণ তার আজ্ঞাবহ সৈনিক। ফেরেশতাকে জানলে সে জানার দ্বারা আল্লাহকে জানা সম্ভব নয়, তাঁর অসীম সত্তার সামান্য রূপক কল্পনা করা যায় মাত্র। জ্ঞান অসীম, ভাষা সসীম। মানবজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দিয়ে অসীম জ্ঞানের পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়, ভাষার মোড়কে তার রূপক ব্যাখ্যা দেয়া যাবে মাত্র।

জ্ঞানের সৈনিকদের পরিচয়, স্বরূপ, কার্যাবলি জানলে জ্ঞানের রূপক ব্যাখ্যা উপলব্ধি করা সম্ভব।

দর্শন

দর্শন কি? দর্শনের অনেক শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা থাকতে পারে, কিন্তু আমি দর্শনশাস্ত্রের নয়, দর্শনের পরিচয় চাই।

দর্শন মানে দেখা। আমরা চোখের দেখাকে দর্শন বলিনা। তা মূলত দর্শনও নয়। দর্শনকে আমরা সম্পৃক্ত করি চিন্তার সাথে। তবে দর্শনের পরিচয় সেটাও নয়। কারণ, তাতে দর্শনের মূল অর্থের (দেখা) বাইরে চলে যেতে হয়। জ্ঞান কখনো চিন্তাকে সীমাবদ্ধ করে না। দর্শনের অনেক শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা থাকলেও জ্ঞান তাতে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়না। সীমাহীন জ্ঞানের সামনে শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সংজ্ঞা মূল্যহীন। জ্ঞান যদি অক্ষরজ্ঞানের বাইরে চিন্তা করতে না-ই শেখায়, তবে তা অসীম কেন? সে ক্ষেত্রে দর্শনের সংজ্ঞা নতুন করে দেয়া যেতেই পারে, তাতে শাস্ত্র একমত হোক বা না হোক।

"চোখের দেখা যেখানে শেষ, সেখান থেকে যে দেখা শুরু তার নাম দর্শন"। যা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখি তা দর্শন নয়, তার বাইরে যা আছে, তার নাম দর্শন। চর্মচক্ষু চতুষ্পদ জন্তুরও আছে, কিন্তু তার দেখা দর্শন নয়। দৃষ্টিশক্তি আর দর্শন এক জিনিস নয়। মানুষ এবং পশুর পার্থক্য যেহেতু জ্ঞানের কারণেই, সুতরাং, তাদের দেখায়ও পার্থক্য থাকবে। যে মানুষ চোখকে শুধু দেখার জন্যই ব্যবহার করবে, তার অবস্থান পশুর চেয়ে উপরে নয়। দর্শনক্ষমতা চক্ষুষ্মান পশুর নেই, পক্ষান্তরে চক্ষুহীন মানুষের আছে।

চিন্তার জগতকে দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে, তবে চিন্তা ও দর্শন ভিন্ন। দর্শন সেই দৃষ্টিশক্তির নাম, যার কোন সীমা নেই। সাগরের গভীরে, আকাশের অসীমে, গিরি-পর্বতের প্রস্তরাকীর্ণ পথে, প্রখর মরু-প্রান্তরে, সময়ের সীমা পেরিয়ে অতীত থেকে ভবিষ্যতে, সব যায়গায় চলার ক্ষমতা তার আছে।

সাগরের গভীরে ডুব দিয়ে তার তলদেশ দেখার নাম দর্শন নয়। দর্শন তাকেই বলে, যার দ্বারা সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে তার গভীরতা চোখের চেয়ে অনেকগুণ বেশি স্বচ্ছভাবে দেখা সম্ভব। চোখ সাগরের গভীরে গিয়ে দেখবে তার তলদেশের প্রানীবৈচিত্র্য, ঝিনুকের খোলস উন্মোচন করে দেখবে ধনভাণ্ডারের চাকচিক্য, অরণ্যের গহীনে গিয়ে দেখবে হিংস্র প্রাণীর ভয়াবহ রূপ,

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখবে দূর দিগন্তের সবুজ সৌন্দর্য্য, হাওয়া উড়ে দেখবে নক্ষত্রলোক, কিন্তু দর্শন তা দেখবে না।

দর্শন সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দেখবে অনাগত ঢেউয়ের বিশালতা, প্রাণীদের প্রাণৈশ্বর্য্য, ঝিনুকের আবরণে মুক্তার সৌন্দর্য, অরণ্যের পাশে দাঁড়িয়ে দেখবে প্রাণীদের হিংস্রতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রাণশক্তি, গহীন আঁধার যাদের জন্য আঁধার নয়। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখবে জমীনের অতলে তার ভিত্তির গভীরতা। শূন্যলোকে চোখ বুলিয়ে সে মুহূর্তেই পাড়ি দিবে দৃষ্টিসীমার চেয়ে অনেক বেশি পথ, চোখের চেয়ে অনেক বেশি সুক্ষ্মভাবে অনুভব করবে নক্ষত্রের আলোর ঝলকানি।

চিন্তা

চিন্তা কি? প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম, এটাই কি প্রকৃতপক্ষে চিন্তা? চিন্তা ছাড়া দর্শন অন্ধ কেন?

অজানাকে জানার নাম চিন্তা। জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ের পরিচয় যার মাধ্যমে জানা যায় তার নাম চিন্তা। জানাকে নিয়ে চিন্তা করে যদি অজানাকে না জানা যায় তবে তার নাম চিন্তা নয়। পরীক্ষাগারে চেনাজানা উপাদানের উপর করা পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি অচেনা বস্তুর উৎপাদন না ঘটায়, তবে সে পরীক্ষা ব্যর্থ। চিন্তা দর্শনের নিত্য সঙ্গী। চিন্তা ছাড়া দর্শন অন্ধ। চিন্তা আর দর্শনের পার্থক্য হলো দর্শন চোখের সীমার বাইরে সবই দেখতে পারে, কিন্তু বিচার করতে পারে না। চিন্তা দর্শনের চেয়েও অনেক বেশি দেখে বলে তার পক্ষে বিচার করা সম্ভব।

দর্শন একটি জিনিস দেখে, চিন্তা তা থেকে নতুন আরেকটি জিনিসের সন্ধান পায়। দর্শন সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দেখবে অনাগত ঢেউয়ের বিশালতা, চিন্তার বিচার খুঁজে বের করবে ঢেউয়ের ভয়াবহতা, সময়ের সীমানা পেরিয়ে সে দেখতে পাবে অতীত-ভবিষ্যতে তার আঘাতের শিকারদের অনুভূতি। দর্শন দেখবে সাগরগর্ভের প্রাণীদের প্রাণৈশ্বর্য্য, চিন্তার বিচার দেখবে প্রতিটি প্রাণীর জীবনযাত্রা, অনুভব করবে তাদের প্রাণশক্তির উৎস। দর্শন দেখবে ঝিনুকের আবরণে মুক্তার সৌন্দর্য, চিন্তার বিচার খুঁজে দেখবে তার সৌন্দর্যের অহংকার, অনুভব করবে কতশত মানুষ তার সন্ধানে প্রাণ হারিয়েছে, স্বচক্ষে দেখবে সৌন্দর্যের অবমাননাকারীর উপর তার নেওয়া নির্মম প্রতিশোধ।

অরণ্যের পাশে দাঁড়িয়ে দর্শন দেখবে প্রাণীদের হিংস্রতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রাণশক্তি, গহীন আঁধার যাদের জন্য আঁধার নয় আর চিন্তার বিচার খুঁজে বের করবে তাদের শক্তির উৎস। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দর্শন দেখবে জমীনের অতলে তার ভিত্তির গভীরতা, চিন্তার বিচার তাকে বলে দেবে পাহাড়ের এ দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকার ইতিহাস। শূন্যলোকে চোখ বুলিয়ে দর্শন মুহূর্তেই পাড়ি দিবে দৃষ্টিসীমার চেয়ে অনেক বেশি পথ, চোখের চেয়ে অনেক বেশি সুক্ষ্মভাবে অনুভব করবে নক্ষত্রের আলোর ঝলকানি, আর চিন্তার বিচার দেখবে আলোর আড়ালে তাপশক্তির তীব্রতা, খুঁজে বের করবে তার আলো ও তাপের উৎস। কোন কিছু জানার উদ্দেশ্যে চিন্তা করাকে চিন্তা

বলা যেতে পারে, তবে তা অসম্পূর্ণ। অজানাকে জানার দ্বারা চিন্তা সম্পূর্ণ হয়।

চিন্তা ছাড়া দর্শন অন্ধ কেন? এর উত্তরও অনেকটা চলে এসেছে। চিন্তা ছাড়া দর্শন এজন্য যে, তার দৃষ্টি কোন কিছুকে দেখতে পারে, কিন্তু তার সত্যাসত্য বিচার করার শক্তি নেই। কেউ যদি বলে, 'এ বিষয়ে আমার দর্শন এই'- তা সত্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তার দর্শন সঠিক হওয়ার জন্য চাই চিন্তার বিচার। উভয় মিলে যদি বিশ্বাসের পথ খুঁজে পায় তবেই তা সত্য, অন্যথায় নয়। শুধু 'দর্শন' সম্পর্কে বলতে গেলে এটাই বলতে হয়। কিন্তু দর্শনকে যারা শাস্ত্রের রূপ দিয়েছেন, তারা দর্শনের সাথে চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। চিন্তা দর্শনশাস্ত্রের অংশ, দর্শনের অংশ নয়। দুটি মিলেই শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করেছে। তবে তাকেও বিশ্বাসের ঘাটি পার হয়েই সত্যের কাছে যেতে হয়।

বিশ্বাস

বিশ্বাস কি?

দর্শন ও চিন্তার সমন্বয়ের নাম বিশ্বাস। দর্শনকে চিন্তার বিচারে মেপে দেখার পর যে ফলাফল আসে, তা হলো বিশ্বাস। দর্শন যেমন চিন্তার উপর নির্ভরশীল একইভাবে বিশ্বাসও নির্ভরশীল চিন্তার উপর। দর্শনের ভুল চিন্তা ধরিয়ে দিতে পারে, চিন্তার ভুল ধরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা বিশ্বাসের নেই। বরং চিন্তা ভুল করে বসলে বিশ্বাস বিপথে চলে যাবে। চোখে দেখা জিনিসকে চিন্তা যদি সায় না দেয়, তার বিশ্বাস অর্থহীন, চিন্তা ভুল বিচার করলে বিশ্বাস হয়ে যাবে অন্ধ। অন্যদিকে না দেখা জিনিসের দর্শনকে চিন্তা যদি সমর্থন দেয়, তার বিশ্বাস চাক্ষুষ বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

কোন কথা শোনার পর তাকে আগাগোড়া গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করবে দর্শন। চিন্তা তাকে পথ দেখাবে, কথাটির যে ফলাফল দর্শন খুঁজে পেল তা নিরীক্ষা করবে, কথাটির ইতিহাস ঘেটে উদঘাটন করবে কথার পেছনের না বলা কথা আর বলা কথার উপযুক্ততা, তার প্রাপ্ত ফয়সালার উপর নির্ভর করবে বিশ্বাস। তিনটি ধাপ সফলভাবে পার করতে পারলে কথাটিকে বিশ্বাস করা সার্থক। কথাটির বলাও সার্থক।

কোন ঘটনা চোখে দেখার পর দর্শন তার গভীরে ঢুকে যাবে, জানার চেষ্টা করবে এর পেছনে ঘটা আর না ঘটা আরো অনেক ঘটনা, যা এই ঘটনাকে ঘটতে সাহায্য করলো। চিন্তা ঘটনাটিকে তার অতীত-ভবিষ্যত দেখে বিচার করবে, জানা ঘটনার অজানা দিক জানবে আর তার প্রাপ্ত ফলাফল ঘটনাকে বিশ্বাসের উপযোগী করে তুলবে। ঘটনাটির কোন দিক অসম্পূর্ণ, অস্বচ্ছ কিংবা অযৌক্তিক হলে চিন্তার বিচারে তা ধরা পড়বে, ধরা পড়লে বিশ্বাস তাকে গ্রহণ করবে না।

কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করার পূর্বে দর্শন তার না দেখা জিনিসকে দেখার চেষ্টা করবে। চিন্তা তাকে পথ দেখাবে, তার সকল মানবীয় গুণাবলিকে মেপে দেখবে তার নিজ গুণের বিচারে, তার বিচার সঠিক হলে বিশ্বাস সার্থক, অন্যথায় এর ফলাফল কি! তা বিশ্বাস ভাঙ্গার বলি হৃদয় খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারবে।

ইতিহাসকে বিশ্বাস করতে হলে দর্শন প্রথমে তার দৃষ্টিকে সময়ের সীমা ভেদ করে অতীতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তার দৃষ্টিশক্তি তাকে দেখাবে সে ঘটনার চাক্ষুষ অপেক্ষা স্বচ্ছ চিত্র। চিন্তা তার বিচারে জানবে ঘটে যাওয়া ঘটনার না ঘটা অজানা দিক, তার ফলাফল বিশ্বাসকে পথ দেখাবে। চিন্তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যদি বিশ্বাস তাকে গ্রহণ করে তবে সেটা ইতিহাস, অন্যথায় তা কালের মহাসাগরে ভাসমান মিথ্যা, যাকে কোন জ্ঞানহীন চেয়েছে ইতিহাসে রূপ দেয়ার।

বইয়ের পাতার লেখা বিশ্বাস করার আগে দর্শন দেখার চেষ্টা করবে অক্ষরের শৃঙ্খলে বাঁধা পরে প্রকাশ না হওয়া কথাগুলো, চিন্তা জানতে চেষ্টা করবে চাক্ষুষ লেখনীর অজানা অর্থ, আর তার ফলাফল বিশ্বাসকে পথ দেখাবে। চিন্তার বিচারের পর বিশ্বাস যদি তাকে গ্রহণ করে, তবে তা জ্ঞানের উপাদান অন্যথায় তা জ্ঞানের উপকরণের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। জ্ঞান এ অপরাধ ক্ষমা করবে না।

কেউ যদি এ কথাগুলো বলে, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না', অথবা 'নিজের উপর বিশ্বাস রাখ', কিংবা 'এক আল্লাহকে বিশ্বাস কর'- সবগুলো কথার মধ্যেই কি 'বিশ্বাস' বলতে একই জিনিসকে বুঝায়?

বিশ্বাসের ভিন্ন অর্থ নেই। বিশ্বাসকে তিনটি বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। আল্লাহকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে চিন্তা এবং দর্শন বিশ্বাসকে সঠিক পথ দেখিয়েছে, এটা নিশ্চিত। কারণ আল্লাহ তায়ালা অসীম, মানবজ্ঞানের চিন্তাশক্তি সসীম। তবে জ্ঞান যেহেতু অসীম, আর জ্ঞানই যেহেতু চিন্তা, দর্শন এবং বিশ্বাসকে সঠিক পথে পরিচালনা করে, তাই আল্লাহকে বিশ্বাস করার অর্থ বিশ্বাস সঠিক পথে এগিয়েছে। বিশ্বাস যখন অসীম জ্ঞানের পথ পেয়েছে, তখন সসীম জ্ঞান দিয়ে তার ভুল-শুদ্ধ বিচার করার কোন সুযোগ নেই। সত্যের সন্ধান কেবল এ পথেই।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে, চিন্তা বিশ্বাসকে যে পথ দেখিয়েছে তা অসম্পূর্ণ, কারণ এ বিশ্বাস সাময়িক। নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য, নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যের জন্য যাকে বিশ্বাস করা হবে সে সসীম, তার বিশ্বাস সত্যের সন্ধান দেবে না।

পূর্বে বলা হয়েছে, বিশ্বাস সন্ধান দেয় সত্যের। তাহলে এবার সত্যের কাছে যাওয়া যাক।

সত্য

সত্য কি?

দর্শন আর চিন্তা যদি সঠিক বিশ্বাসকে খুঁজে পায়, তার ফলস্বরূপ যা পাওয়া যাবে সেটাই একমাত্র সত্য। এর দ্বিতীয় কোন পরিচয় নেই, দ্বিতীয় কোন উপমা নেই, দ্বিতীয় কোন অর্থ নেই। সত্যকে চিনতে হয় একমাত্র সত্য দিয়েই। প্রশ্ন হতে পারে, সত্যের দ্বিতীয় কোন রূপ নেই কেন? উত্তর হবে, সত্যের দ্বিতীয় রূপ হলো মিথ্যা। মিথ্যাকে আলাদা করে চেনার কিছু নেই। সত্যের বাইরে যা আছে সবই মিথ্যা। সত্যকে সত্য বলে না জানার নাম মিথ্যা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জানার নাম সত্য।

জ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য সত্যের সন্ধান। দ্বিতীয় কোন লক্ষ্য নেই। জ্ঞানের রাজ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর সৈনিক সত্য। অন্যগুলোকে জয় না করতে পারলে একে পাওয়া যায় না। অন্য সৈনিকদেরকে জয় না করতে পারলে শাস্তিস্বরূপ তারা ভুল পথ দেখাবে, সে পথ সত্যের নয়।

জ্ঞানের রূপক ব্যাখ্যা

যে প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানের রাজ্যের সাথে পরিচিত করা হলো, তা এখনো পরিষ্কার নয়, জ্ঞানের উপমা কিংবা রূপক কোন ব্যাখ্যা এখনো আসে নি।

জ্ঞানের রাজ্যের সবগুলো সৈন্য-সামন্তের সাথে পরিচয় হওয়ার পর এখন জ্ঞানকে রূপক ব্যাখ্যায় বুঝানো যেতে পারে।

জ্ঞান যদি সাগর হয়, দর্শন তাতে মুক্তা আহরণে ঝাপিয়ে পড়া ডুবুরি, চিন্তা যাকে অতল গভীরের পথ দেখায়, বিশ্বাস যাকে জানিয়ে দেয় ধনভাণ্ডারের আধার কোথায়, সত্য যার কাছে ধরা দেয় আরোহিত মুক্তা হয়ে।

জ্ঞান যদি প্রস্তরাকীর্ণ পর্বতমালা হয়, দর্শন তার দূর্গম পথের নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী, চিন্তা যাকে গিরিখাতের মাঝে গন্তব্যের নিশানা দেখায়, বিশ্বাস যাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করার শক্তি এনে দেয়, পাথরের আড়াল থেকে কুড়ানো পরশ পাথর যার সামনে সত্য হয়ে আবির্ভুত হয়।

জ্ঞান যদি প্রখর মরু-প্রান্তর হয়, দর্শন তাতে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটানো বেদুইন, চিন্তা যাকে অসীমের পানে ডাকে, বিশ্বাস যাকে মরীচিকা জয় করার সাহস যোগায়, বালুকণার তলদেশ থেকে খুঁজে পাওয়া সুপেয় জলভাণ্ডার সত্য হয়ে যার পদচুম্বন করে।

জ্ঞান যদি জীবন সফরের পথ হয়, দর্শন তাতে ছুটতে থাকা ক্লান্তিহীন পথিক, চিন্তা যাকে সহযাত্রী হয়ে সংগ দেয়, বিশ্বাস যার দেহে প্রতিনিয়ত শক্তির সঞ্চার করে, দিগন্ত যার দৃষ্টিসীমায় সত্য হয়ে ধরা দেয়।

জ্ঞান যদি কাব্য হয়, দর্শন তার কলম, চিন্তা যার মধ্য দিয়ে কালির ফোয়ারা ছোটায়, বিশ্বাস যার পঙক্তি রচনায় শক্তি সঞ্চার করে, সত্য যার প্রতিটি পঙক্তিতে জোয়ার জাগানো ছন্দের ঝংকার হয়ে আন্দোলিত করে মনকে।

জ্ঞান যদি শূন্যলোক হয়, দর্শন তার নভোযাত্রী, চিন্তা যাকে ডেকে নিয়ে যায় আলো-আধারির রহস্যভেদ করতে, বিশ্বাস যাকে শূন্যে ভাসার শক্তি দেয়, আর অসীম আধারের মাঝে খুঁজে পাওয়া আলোর ঝলক যাকে দেয় সত্যের সন্ধান।

এসবের মধ্য দিয়েই একমাত্র আলোর সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এর বাইরে সীমাহীন অন্ধকার।

জ্ঞান কেন আলো? অজ্ঞতা কেন অন্ধকার?

জ্ঞানকে আলোর সাথে আর অজ্ঞতাকে অন্ধকারের সাথে তুলনা করার অর্থ কি?

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন- "কি আছে আর কি নেই আলো-আধারে?" অর্থাৎ মহাবিশ্ব দুইটি অংশে বিভক্ত। আলো আর অন্ধকার। আলো-আধারের বাইরে কিছু নেই। যেখানে আলো নেই, সেখানেই অন্ধকার। আলোর সীমা আছে, কিন্তু অন্ধকারের কোন সীমা নেই। আলোর মাঝে থাকলে কেউ পথ খোঁজার চেষ্টা করুক বা না করুক, অন্তত পথ হারাবে না। অন্ধকারে চলে গেলে পথ হারাতে বাধ্য, কারন সেটা সীমাহীন। সেখানে একবার হারিয়ে গেলে পথ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। পথ খুঁজে পাওয়ার সামান্য সম্ভাবনা নির্ভর করে কতটুকু গভীরে হারিয়ে গেছে, তার উপর।

এটা গেল ভৌত বিজ্ঞাননির্ভর আলো-আধারের ব্যাখ্যা। এবার আসা যাক জীবনদর্শনের আলোচনায়-

পূর্বের কথা অনুযায়ী দর্শন, চিন্তা আর বিশ্বাস এক না হলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। এগুলোকে সঠিক পথে চালনা করে একমাত্র জ্ঞান। এরা একবার পথভ্রষ্ট হলে সত্যের সন্ধান অসম্ভব। সত্যই একমাত্র আলো। 'সত্য' আর 'জ্ঞান'- পার্থক্য এতটুকু যে, জ্ঞানের বিস্তৃতি অসীম, সত্যের আলো সসীম। তা না হলে একবার যে অজ্ঞতার অন্ধকারে হারিয়ে যাবে তার আর ফেরার পথ থাকবে না, জ্ঞানের শক্তি আর বিস্তার অসীম বলেই ফিরে আসা সম্ভব। তবে আলোর সন্ধান পাওয়ার পর সত্য আর জ্ঞান একটি অন্যটি থেকে পৃথক হতে পারে না। পৃথক হলে তাদের অস্তিত্ব থাকে না। আবার হারিয়ে যায় সীমাহীন অন্ধকারে।

"জ্ঞান আলো, অজ্ঞতা অন্ধকার"- কথাটির আরেক অর্থ হচ্ছে- বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা 'আলো' ও 'অন্ধকার' উভয় জগতেই জ্ঞানের বিস্তার বিদ্যমান, তবে তার দ্বারা পথ খুঁজে পাওয়া আর না পাওয়াই হচ্ছে প্রকৃত 'আলো' এবং 'অন্ধকার'।

জ্ঞান অর্জন কিভাবে হবে?

জ্ঞানই যদি সত্যের সন্ধান বা আলোর পথের সন্ধান পাওয়ার একমাত্র উপায় হয়, তা অর্জন করা যাবে কিভাবে? জ্ঞান কি সকলেই অর্জন করতে পারে?

দ্বিতীয়টির উত্তর হচ্ছে, না সকলেই পারে না। জ্ঞান যার কাছে আছে সে-ই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। যার নেই সে পারে না। এটা এতটা সহজলভ্য নয় যে, সকলেই অর্জন করতে পারবে। জ্ঞান জ্ঞানীদের জন্যই, মুর্খদের পক্ষে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

কথাটির দ্বারা হয়ত বৈষম্য তৈরি হয়ে গেল। তাহলে ভেঙ্গে বলার চেষ্টা করি। জ্ঞান অর্জনের সূচনা হয় দর্শন থেকে, তাকে পথ দেখায় চিন্তা, তার পথ চলার ক্ষেত্রে প্রাণশক্তির যোগান দেয় বিশ্বাস, আর তার চূড়ান্ত সফলতা সত্যের সন্ধান। দর্শনক্ষমতা প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান, চিন্তার দ্বারা তাকে যে সঠিক পথ দেখাতে পারে না, সে মুর্খ। চিন্তাশক্তি সবার মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু যার জ্ঞান নেই তার চিন্তা সঠিক পথ খুঁজে পাবে না। বিশ্বাস সকলের অন্তরেই বিদ্যমান, যার বিশ্বাস চিন্তা আর দর্শনের সমন্বয় নয়, সে মুর্খ। তার বিশ্বাস সত্যের সন্ধান পাবে না। জ্ঞানের সূচনা জ্ঞান থেকেই। সত্যের সন্ধান সে জ্ঞান উপলব্ধিতে আসার একমাত্র মাধ্যম। সত্যকে না জানা পর্যন্ত জ্ঞানকে জ্ঞান বলে অভিহিত করা যায় না। জ্ঞানকে অর্জন করতে হয় জ্ঞান দিয়েই, মুর্খতা দিয়ে নয়।

জ্ঞান অর্জনের উপায়-উপকরণকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি পঞ্চইন্দ্রীয়, দ্বিতীয়টি ঐশীবাণী। প্রথমটি সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছানোর জন্য, আর দ্বিতীয়টি অসীম জ্ঞানের সামনে নিজের অজ্ঞতাকে বুঝার জন্য। প্রথমটির দ্বারা মানবজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার চূড়ায় পৌঁছানো সম্ভব, আর দ্বিতীয়টির দ্বারা অসীম জ্ঞানের দিগন্তে ছুটে চলা সম্ভব। প্রথমটির কাজ সীমাবদ্ধ পাত্রকে পূর্ণ করা, দ্বিতীয়টির কাজ অসীম সাগরের তীরে দাঁড় করিয়ে দেয়া।

পঞ্চইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান অর্জন তখনই সম্ভব হবে যখন ইন্দ্রিয়গুলোকে ব্যবহার করা হবে জ্ঞানকে অর্জন করার জন্য, ধারণ করার জন্য।

চোখের কাজ যদি হয় শুধু দেখা, কানের কাজ যদি হয় শুধু শোনা,

নাকের কাজ যদি হওয়া শুধু গন্ধ অনুভব আর শ্বাস গ্রহণ করা, মুখের কাজ যদি হয় শুধু ভক্ষণ করা, ত্বকের কাজ যদি হয় শুধু স্পর্শ অনুভব করা, হাতের কাজ যদি হয় শুধু কোন কিছু ধারণ করা, পায়ের কাজ যদি হয় শুধু চলাচল আর দেহের ভার বহন করা, তবে পশু আর মানুষের পার্থক্য থাকে না। এ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পশুরও রয়েছে, তারাও এ কাজগুলোই করে কিন্তু তাদের দ্বারা জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়।

দেহের প্রতিটি অঙ্গ যখন জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান শুধু তখনই অর্জন করা সম্ভব।

সকল জ্ঞানের আধার

সকল জ্ঞানের আধার কোনটি? জ্ঞানের এমন কি কোন উৎস আছে, যা থেকে জ্ঞান অর্জন করলে আর কোন কিছু জানার প্রয়োজন নেই? জ্ঞান যেহেতু অসীম, তাই এমন একটি উৎস থাকাটা জ্ঞানের দাবী। কারণ মানবসৃষ্ট জ্ঞানের উপকরণ, ক্ষেত্র, উৎস সবই প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ।

জ্ঞান অর্জনের উপকরণের দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ ওহী মানুষকে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাইরে অসীম জ্ঞানের সন্ধান দেয়। জ্ঞান এবং ওহীর পরিচয় অন্যভাবে দেয়া যায় এ কথা বলে যে, 'ওহীই জ্ঞান, জ্ঞানই ওহী'।[৩৫] আল্লাহ তায়ালার এই মহান গুণটি মানুষের সামনে প্রকাশিত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ওহী। সুতরাং, সকল জ্ঞানের একমাত্র আধার পবিত্র কুরআন।

কুরআনের জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করার জন্য একজন সাহাবীর উক্তিই যথেষ্ট, যিনি বলেছেন, "কুরআনের প্রতিটি আয়াতের অন্তত ষাট হাজার ব্যাখ্যা রয়েছে, অবশ্য কুরআনের যে জ্ঞান আমার কাছে অপ্রকাশিত, তার পরিমাণ এর চেয়ে অনেক বেশি"।[৩৬] কথাটি অমূলক মনে করলে কুরআন সম্পর্কে নিজের মুর্খতাই প্রকাশ করা হবে।

কুরআনের প্রতিটি আয়াতের প্রতিটি শব্দের শাব্দিক অর্থ, রূপক অর্থ, ব্যাবহারিক অর্থ, পারিপার্শিক অবস্থা, যা সম্পর্কে বলা হয়েছে তার বাস্তব পরিচয়, দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ, নাযিলের প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে থাকলে কিংবা তা নিয়ে ভাবতে থাকলে তার শেষ কোথায় গিয়ে ঠেকবে কোন চিন্তাশীলের পক্ষে সম্ভব নয় তার হদীস বের করা। এটাই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান যা থাকলে আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।

কুরআনের একজন ব্যখ্যাকারক[৩৭] বলেছেন, কুরআনের তাফসীর হচ্ছে বাস্তবের জ্ঞান। কুরআনের প্রতিটি আয়াত দিয়ে বাস্তব জগতকে জানাই হচ্ছে

---

৩৫. কুরআনে উল্লেখিত ইবরাহীম (আঃ) এর উক্তি- قد جائني من العلم (আমার কাছে জ্ঞান এসেছে)। এখানে 'ইলম' শব্দ দ্বারা ওহীকে বুঝানো হয়েছে।

৩৬. তাফসীরে রুহুল মায়ানীর ভূমিকায় উল্লিখিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর উক্তি।

৩৭. তাফসীরে রুহুল মায়ানীর রচয়িতা আল্লামা আলুসী (রহ.)।

মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা জানা। বাস্তব জগতের প্রতিটি জিনিসের জ্ঞান যদি কুরআন থেকে না নেয়া হয়, তবে সে জ্ঞান অর্থহীন। কুরআনই সকল জ্ঞানের একমাত্র আধার।

কোন কিছু শেখার উদ্দেশ্য যদি হয় তার দ্বারা কুরআনকে বুঝা, তবে সে বুঝা সার্থক, অন্যথায় নয়। সুতরাং, কাব্যের ছন্দের মাধুর্য, গল্প-উপন্যাসের ঘটনার ঘনঘটা, প্রবন্ধের ভাষার শৈলী, ইতিহাসের জ্ঞান, বিজ্ঞানের গবেষণা, দর্শনশাস্ত্রের চিন্তা, যুক্তিবিজ্ঞানের যুক্তি সকল কিছু অধ্যয়ন ও জানার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে কুরআনকে বুঝা, কুরআনের দ্বারা তাকে বুঝা। অন্যথায় এ জ্ঞান অসম্পূর্ণ, পথভ্রষ্ট।

মানব জ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য

মানুষের পক্ষে অসীম জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়, তাহলে এই সসীম জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? সসীম জ্ঞানের সীমা-ই বা কতটুকু?

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর আগে দেয়া যাক। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে অসীমের সন্ধান লাভ। অর্থাৎ অসীম জ্ঞানের সীমাহীনতা উপলব্ধি করে তার সামনে নিজেকে জ্ঞানহীন মনে করাটাই সসীম জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমা। জ্ঞানের তিনটি স্তর সংক্রান্ত কথাটির উদ্দেশ্যও জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমাকে উপলব্ধি করা। মানুষের এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা যা কিছু করা সম্ভব তার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজটি হলো অন্তরের স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন। যে জ্ঞান অন্তরকে স্বচ্ছ করতে না পারে, তা মূল্যহীন। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, তা জ্ঞান নয়। অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জন জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নয়। অন্তরের পরিশুদ্ধির অভাবেই লোভ, হিংসা, বিলাসিতা, ক্ষমতার লড়াই, দুনিয়াদারি ইত্যাদি মুসলমানের মনে জায়গা করে নিয়েছে।

দুনিয়ার জীবনে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করার চাইতে কঠিন কোন কাজ নেই। কারণ ইবলিস আল্লাহ তায়ালার কাছে মানুষের অন্তরকে বিপথে নেয়ার জন্যই শক্তি প্রার্থনা করেছিল। তার জ্ঞান মানুষের চেয়ে কম নয়। সুতরাং, সসীম জ্ঞানের অধিকারী মানুষের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তার হাতে বিভ্রান্ত হওয়াটা অসম্ভব নয়। বরং জ্ঞানের কারণেই বিভ্রান্ত হওয়ার কথা পবিত্র কুরআনে আছে।[৩৮] সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা অসীম জ্ঞানের সংস্পর্শে আসলেই কেবল এ বিভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব।

অন্তরের এ পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রয়োজন চিন্তার সংশোধন। পূর্বে বলা হয়েছে চিন্তা ভুলপথে চললে বিশ্বাস তার সঠিক পথ খুঁজে পাবে না। চিন্তার সংশোধন বলতে এ ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিন্তার স্বচ্ছতাকে বুঝানো হয়েছে। চিন্তা যদি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যকে ভিন্নপথে নিয়ে যায়, তাহলে বিশ্বাসও ভিন্ন পথ ধরবে, তাতে যে জ্ঞান আসবে তা সত্যের নয়। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বুঝার জন্য জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে - "আমরা জ্ঞানকে দুনিয়ার জন্য চেয়েছিলাম, কিন্তু জ্ঞান আখেরাত ছাড়া অন্য কারো হতে অস্বীকার করেছে"।

---

৩৮. আল্লাহ তায়ালার বাণী- فأضله الله على علم (আল্লাহ তাকে জ্ঞানের উপর পথভ্রষ্ট করেছেন)

জ্ঞান প্রকাশ করা কি জরুরী?

প্রশ্ন হওয়া সঙ্গত যে, মানুষের মাঝে জ্ঞানের প্রতিফলন কিভাবে ঘটে? জ্ঞান প্রকাশ করা কি জরুরী?

দ্বিতীয় অংশের উত্তর, না! সে জ্ঞান প্রকাশ করা আবশ্যক যা অন্যের প্রয়োজন, নিজের কাছে যা আছে তা প্রকাশ করা আবশ্যক নয়। জ্ঞান বিতরণ করার আগে দেখা উচিত, যাকে জ্ঞান দেয়া হচ্ছে এ জ্ঞানের পিপাসা তার আছে কি না। কারো পিপাসা পরিমাপ করে দেখা সহজ কাজ নয়, পাত্র ভর্তি করে পিপাসার্ত ব্যক্তির অপেক্ষায় থাকাও সম্ভব নয়। তাতে পানির অপচয় হবে। মানুষের জ্ঞানের প্রতিফলন মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। জ্ঞান আপনাআপনিই নিজেকে প্রতিফলিত করবে। তাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা বৃথা। জ্ঞানের প্রভাবকে ঢেকে রাখার শক্তি কারো নেই, জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাকেও কোন কিছু দিয়ে ধামাচাপা দেয়া সম্ভব নয়।

যে পাত্র অতৃপ্তের মতো অবিরাম নিজেকে পানি দিয়ে ভর্তি করার চেষ্টা করে যাবে, তার পানি একসময় আপনাআপনিই উপচে পড়বে, সেটা দেখে পিপাসার্ত চুপ করে বসে থাকবে না। চারিদিকে পিপাসার্তদের ভীড় দেখে পাত্রও মন:ক্ষুণ্ন হবে না, নিজের পূর্ণতার চেষ্টা সে করেই যাবে। তার দ্বারা পিপাসার্তদের অভাব মোচন হলে সে অনুভব করবে এক অপূর্ব নিঃস্বার্থ আনন্দ। অন্যদিকে পাত্র নিজেকে পানিভর্তি করার আগেই যদি ফুটো করে পানি বিতরণ করার মতো উদারতা দেখাতে শুরু করে, তার দ্বারা পিপাসার্তের পিপাসা মিটবে না, বরং তা জমীনে শুষে নেবে অথবা বাতাসে হারিয়ে যাবে। স্বেচ্ছায় জ্ঞানের প্রকাশ অর্থহীন। জ্ঞানীদের অবিরাম জ্ঞান সাধনাই জ্ঞানপিপাসুদেরকে কাছে টানবে। উপচে পড়া জ্ঞানের প্রবাহকে মাটি শুষে নেয়ার আগেই তারা পিপাসা মেটানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তাতে স্বয়ং জ্ঞানীর পিপাসাই আরো বাড়বে। তার অতৃপ্ত মনের চাওয়াই পিপাসার্তের পিপাসা মেটাবে। জ্ঞানীর প্রয়োজন নেই জ্ঞানকে বিতরণ করার। জ্ঞান উপযুক্ত হৃদয়ে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিজেই পালন করবে। যে নিজের ভান্ডার পূর্ণ করার দিকে মনযোগী না হয়ে জ্ঞান বিতরণ করার উদারতা দেখাতে যাবে, জ্ঞান তার অন্তর ত্যাগ করবে। জ্ঞান তার জন্য, যে জ্ঞানের জন্য হয়ে যায়। জ্ঞানকে নিজের করে নেয়ার চেষ্টা যে করে, জ্ঞান তার জন্য নয়। জ্ঞানের আত্মমর্যাদায়

আঘাত হানলে জ্ঞান নিঃশব্দ অভিমানে বিদায় নিবে। জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে পূর্ণ করার চেষ্টা না করে বিতরণ করার আরেক অর্থ হচ্ছে পূর্ণ হওয়ার আগেই নিজেকে পূর্ণ ভাবা। কোন এক জ্ঞানী ব্যাক্তি বলেছেন, "কেউ যতক্ষণ জ্ঞানের অন্বেষণে থাকবে ততক্ষণ জ্ঞানী থাকবে, নিজেকে জ্ঞানী ভাবলে সে আর জ্ঞানী থাকবে না"।

প্রশ্ন হতে পারে, **হাদীসে জ্ঞান গোপন করাকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে জ্ঞান প্রকাশে নিরুৎসাহিত করা কেন?**

উত্তর হচ্ছে, এর দ্বারা জ্ঞান প্রকাশে উৎসাহ দেয়া হয়নি বরং জ্ঞানকে গোপন করার ক্ষতি বুঝানো হয়েছে। জ্ঞানকে গোপন করার আরেক অর্থ নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ করা। জ্ঞানকে গোপন করতে চাইলে উপচে পড়া পানির প্রবাহ বন্ধ করতে হবে। তখন নিজের মধ্যে পানি প্রবেশ করানোর জায়গাও আর থাকবে না। সুতরাং, জ্ঞানীমাত্রই এ কাজ করবে না।

জ্ঞান প্রকাশের মাধ্যম; বলা ও লেখা

তাহলে জ্ঞানী ব্যাক্তিদের জ্ঞানদানের মাধ্যম হিসেবে বলা এবং লেখাকে বেছে নেয়ার কারণ কি? প্রশ্নটা এভাবে এজন্যই বলা যে, বলা ও লেখা ব্যতীত জ্ঞানদানের তৃতীয় কোন মাধ্যম নেই।

এটা ঠিক যে, জ্ঞানীদের কথা ও লেখনী তাদের জ্ঞান প্রকাশের মাধ্যম। তবে তাদের এ দুটি কাজ জ্ঞান প্রকাশের জন্য নয়, বরং জ্ঞান অর্জনের জন্য। পূর্বে বলা হয়েছে প্রতিটি কাজ জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে হলে তবেই জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, অন্যথায় নয়। যখনই কেউ এ উদ্দেশ্যে কথা বলবেন বা লিখবেন যে, আমি এর দ্বারা কাউকে জ্ঞানদান করছি, তখন আর তিনি জ্ঞানী থাকবেন না।

জ্ঞানী ব্যক্তির কথা হয়ে থাকে এমন, যা অনেক না বলা কথাকে বলে দেয়। তাদের লেখনী হয় এমন, যা সসীম শব্দের শৃঙ্খলে অসীমকে বেঁধে রাখতে সক্ষম। তাদের লেখা এবং বলা আমাদেরকে এটা অনুভব করতে শেখায় যে-

পৃথিবীতে বলা কথার চেয়ে না বলা কথার পরিমাণ অনেক বেশি।

লেখার ভাষায় প্রকাশ হওয়া অনুভূতির তুলনায় অপ্রকাশিত চিন্তার জগতের বিস্তৃতি অনেক বিশাল।

দৃশ্যমান বস্তুর ভয়ের তুলনায় অদৃশ্য আতংকের প্রভাব অনেক বেশি।

তপ্ত ভাষায় প্রকাশিত ক্ষোভের তুলনায় অপ্রকাশিত নীরব অভিমানের পরিমাণ অনেক বেশি।

চাক্ষুষ জিনিসের বিশ্বাসের তুলনায় অদৃশ্যে বিশ্বাসের মূল্য অনেক বেশি।

চোখের সামনে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ধাক্কার তুলনায় অনাগত ঢেউয়ের অনুমিত তীব্রতার ধাক্কা অনেক বেশি।

ভূ-পৃষ্ঠের উপরের পাহাড়ের তুলনায় সমুদ্রতলের পাহাড়ের উচ্চতা অনেক বেশি।

ঘন অরণ্যের অভ্যন্তরে বিচরণ করা প্রাণীর তুলনায় সাগরগর্ভের প্রাণীবৈচিত্র অনেক বেশি।

সুউচ্চ পর্বতমালার দৃশ্যমান উচ্চতার তুলনায় পাতালের গভীরতা অনেক বেশি।

এবং জ্ঞান নামক পরশ পাথরের সন্ধান পাওয়া ব্যক্তিদের তুলনায় পাথরের সন্ধানে বেরিয়ে দুর্গম গিরি-কান্তার-মরু দুস্তর পারাবারের মাঝে হারিয়ে ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেশি।

যুক্তি-তর্ক বনাম বিশ্বাস

লেখা ও বলা উভয়ক্ষেত্রেই মানুষ যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিয়ে থাকে। জ্ঞানের বিচারে যুক্তির অবস্থান কোথায়? অবিশ্বাসীরা যে কথাটি সবচেয়ে বেশি বলে থাকে, তা হলো যুক্তির কষ্টিপাথরে যা টিকে না তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করার কোন অর্থ হয় না। চিন্তা, দর্শন আর বিশ্বাস যদি সত্যের সন্ধানলাভের উপায় হয়ে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে যুক্তির অবস্থান কোথায়?

জ্ঞান প্রকাশের জন্য মানুষ যুক্তিতর্কের আশ্রয় নিয়ে থাকে। যুক্তির প্রথম অসারতা হচ্ছে, এটা ব্যবহৃত হয় তাদের দ্বারাই যারা জ্ঞান প্রকাশ করতে চায়। জ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা একটা অপরাধ। যুক্তির সবচেয়ে বড় অসারতা হলো সে চিন্তা আর দর্শনের সমন্বয় ব্যতীতই সত্যের সন্ধান চায়, যা অসম্ভব। আগে বলা হয়েছে দর্শন আর চিন্তার সমন্বয় হচ্ছে বিশ্বাস। চিন্তা যদি দর্শন দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, তবে তা থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাস হবে অর্থহীন।

বিশ্বাস চিন্তাকে অনুসরণ করে, তবে তাকে সত্য বলে মেনে নিতে সে বাধ্য নয়। কারণ বিশ্বাসকে পরিচালনা করে জ্ঞান। চিন্তা বিশ্বাসকে ভুল পথ দেখাতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস তার ভুল ধরতে পারবে, যদি জ্ঞান তার সাথে থাকে। যুক্তি এখানে যা করে তা হলো, চিন্তাকে জোর করে বিশ্বাসের উপর চাপিয়ে দেয়, বিশ্বাসকে চিন্তার অনুসারী হতে বাধ্য করে।

যুক্তি কখনো বিশ্বাসের চেয়ে বড় হতে পারে না। যুক্তিবাদীর হাজারটা যুক্তির সামনে এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না"। তাতে বিশ্বাসীর যুক্তি বোঝার অক্ষমতা নয়, যুক্তির অসারতাই প্রকাশ পায়। বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তি দিতে যাওয়ার আরেক অর্থ জ্ঞান জাহির করতে যাওয়া, যা জ্ঞানহীনের পরিচয় বহন করার জন্য যথেষ্ট।

যুক্তিবাদীর যুক্তির সামনে "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না" বলে দেয়াটা কেন যুক্তির অসারতাকে প্রকাশ করবে? যুক্তি না বোঝা বা যুক্তি গ্রহণ না করা কি বিশ্বাসীর অক্ষমতা নয়?

পূর্বে আলোচিত হয়েছে- সসীম জ্ঞানের সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে অসীমের সামনে নিজের অজ্ঞতাকে উপলব্ধি করা। অক্ষমতা সকল ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নয়। অন্যদিকে যুক্তিবাদী যদি অসীম জ্ঞানের জগতের তোয়াক্কা না করে নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে, তা প্রকৃতপক্ষে অসারই।

কারণ, হতে পারে যে সে বিষয়ে বলতে চাচ্ছে সে বিষয়ের সম্যক জ্ঞান তার আছে, কিন্তু সে নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না কিংবা যা রাখে তা অসম্পূর্ণ।

এ ক্ষেত্রে তার যুক্তির পিছনে কতটুকু জ্ঞানের গভীরতা বিদ্যমান সেটা বড় কথা নয়। বরং তার 'জ্ঞান' তাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে। জ্ঞানের যতটা গভীরে সে গিয়েছে বলে মনে করে, অজ্ঞতার ঠিক ততটাই গভীরে সে হারিয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসীর 'অক্ষমতা' কোন বিষয় নয়। বরং সে যুক্তি গ্রহণ করা হবে না এজন্যই যে, যুক্তিবাদী নিজের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কেই জ্ঞান রাখে না। আমি কোন বিষয়ে কতটা জানি, সেটা জানা আমার জ্ঞানের পরিধিকে বুঝায় না। আমি কি জানিনা সেটা জানাই প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ।[৩৯]

---

৩৯. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) কে অনুরোধ করা হয়েছিল ইলমে ফিকহের প্রখ্যাত কিতাব 'হেদায়া' এর মত করে একটি গ্রন্থ সহজবোধ্য করে লেখার জন্য। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হেদায়া'র মত একটা লাইন লেখাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেছেন, কুরআনের পর তিনটি কিতাব রয়েছে, যার মত কিতাব আমি কোনদিনও লিখতে পারবো না। ১. বুখারী শরীফ ২. হেদায়া ৩. মসনবী শরীফ। এগুলোর দ্বারা তিনি বিনয়ের সাথে নিজের অক্ষমতাকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই কথার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়? তার অক্ষমতা? নাকি উক্ত কিতাবগুলোর উপর তার জ্ঞানের গভীরতা? মনে রাখা ভালো, সকল অক্ষমতাই নিন্দনীয় নয়, বরং নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে জানা জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর।

সত্যের সন্ধানে কোনটি অগ্রগণ্য?

কিন্তু অনেক যুক্তিবাদী তো যুক্তিকে ব্যবহার করে থাকেন সত্যের অন্বেষণের জন্যই। তারা কি তাহলে ভুল করছেন? তাদের ভুলটা কোথায়? সত্যের অনুসন্ধানে প্রকৃতপক্ষে কোনটি অগ্রগণ্য? কেন?

এটা ঠিক যে, সকল যুক্তিবাদীই জ্ঞান জাহির কিংবা চিন্তাকে বিশ্বাসের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য যুক্তিকে ব্যবহার করেন না। সত্যান্বেষী যুক্তিবাদীর সংখ্যা পৃথিবীতে নেহাত কম নয়। তবে হ্যাঁ, তারা ভুল করছেন। কিভাবে?...

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ একটি বিশ্বাস নিয়ে চলে। সেটা হোক তার নিজের উপর কিংবা অন্যের উপর। আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির বিশ্বাস মানুষের সামনে প্রকাশ পায় 'বিশ্বাস' হিসেবে। আর অবিশ্বাসী ব্যাক্তির বিশ্বাস থাকে তার মনে গোপনে। মানুষের সামনে তার অবিশ্বাসী এবং যুক্তিবাদী রূপ প্রকাশ পায়। কারণ তার ভিতরে রয়েছে ভিন্ন আরেকটি 'বিশ্বাস'। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে অবিশ্বাসী বলতে কেউ নেই।[৪০] যারা আছে 'অবিশ্বাসী' রূপটা তাদের বাহ্যিক রূপ মাত্র। অর্থাৎ সে নিজেও তার বিশ্বাসের বলেই পরিচালিত। তার বিশ্বাসকে অন্যের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যই সে যুক্তি নামক অস্ত্রটি ব্যবহার করে। যুক্তির উদ্ভবও হয়েছে এভাবেই। সত্যানুসন্ধানের জন্য যুক্তির আবির্ভাব ঘটে নি। তাহলে সেটা কিভাবে সত্যের সন্ধান দিতে পারে?

সত্যানুসন্ধানের জন্য যুক্তির আবির্ভাব ঘটে নি- কথাটির ব্যখ্যা কি?

যুক্তিবিদ্যার উপর যারা পড়াশোনা করেন, তারা খুব ভালো করেই জানেন যে, যুক্তির সংজ্ঞা হচ্ছে, **কোন বিষয়কে নিজের চিন্তাশক্তির দ্বারা পর্যালোচনা**

---

৪০. আল্লাহ তায়ালার বাণী- وله اسلم من في السموت والارض طوعا وكرها واليه يرجعون (আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং তার নিকটেই ফিরে যাবে)। উক্ত আয়াতটি অবিশ্বাসীরা হামেশাই শুনে থাকে এবং এর বিপরীতে যুক্তিও দিয়ে থাকে। নিজের বিশ্বাসের উপর অন্ধভাবে অটল থাকা সত্যানুসন্ধানীদের কাজ নয়। নিজের বিশ্বাসকে প্রতিনিয়ত নতুন করে জানার চেষ্টাই সন্ধান দেয় সত্যের। এতে যারা সঠিক বিশ্বাসের পথে আছেন তাদের বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয়, আর যারা ভুলের মধ্যে আছেন, তারা সন্ধান পাবেন সত্যের। আল্লাহ তায়ালার বাণী অসীম জ্ঞানের আধার। এটা একবার পড়ে বুঝে যাওয়া, কিংবা এ তৃপ্তি লাভ করা যে, আমি বুঝে গেছি উভয়টিই অর্থহীন। বিশ্বাসী এবং যুক্তিবাদী উভয়পক্ষের প্রতি অনুরোধ থাকলো আয়াতটিকে নতুন করে জানার। অসীম জ্ঞানের পরশ আরেকবার পাওয়ার।

করে তা উপযুক্ত কারণ দর্শানোর মাধ্যমে উপস্থাপন করা। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, যে চিন্তাশক্তির দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে তা সঠিক পথে যাচ্ছে কিনা তা বিচার করবে কে? যে উপযুক্ত কারণ দর্শানোর মাধ্যমে সেটা উপস্থাপন করা হবে, তার উপযুক্ততার মাপকাঠি কি?

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিবাদীরা বলবেন, চিন্তাশক্তিই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এটাকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য হতে হবে স্বাধীন। অর্থাৎ চিন্তাশক্তির উপর কোন পূর্ব-অনুমান বা একতরফা চিন্তার প্রভাব থাকবেনা। তাহলে চিন্তাশক্তি সঠিক পথে যাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা যেটা করতে পারবেন না, তা হলো- চিন্তাশক্তির উৎসের সন্ধান।

চিন্তাশক্তির উৎস কি? তার ক্ষমতা কতটুকু, তার ভুল-শুদ্ধ কিভাবে ঘটে, তাকে সঠিক পথে চালানোর 'নিশ্চিত' উপায় কি? -এ সকল প্রশ্নের উত্তর তাদের কাছে নেই। কারণ নিজের চিন্তাশক্তিকে নিশ্চিতভাবে সঠিক কেউ বলতে পারবেন না। দাবী করলেও প্রমাণ দিতে পারবেন না। চিন্তাকে সঠিক প্রমাণ করার এমন কোন উপায়ই নেই যার দ্বারা চিন্তার স্বচ্ছতাকে চোখে বা অন্তর্চোখে দেখা যায়। সুতরাং, এ পথ সত্যানুসন্ধানের নয়। চিন্তাকে সঠিক বলে প্রমাণ করার আরেক অর্থ নিজের চিন্তায় প্রাপ্ত ফলাফলকে বিশ্বাস করে নেয়া। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা আর কিছু না হলেও নিজের উপর বিশ্বাসী। কিন্তু অসীমের বিশ্বাসের সামনে সসীমের বিশ্বাসের কোন মূল্য আছে কি?

বিশ্বাসের সামনে যুক্তি মূল্যহীন কেন?

পূর্বে আলোচিত হয়েছে, চিন্তা বিশ্বাসের পথ দেখায়। আবার যুক্তিকেও পথ দেখায় চিন্তা। তাহলে বিশ্বাসের সামনে যুক্তি কেন মূল্যহীন?

বিশ্বাস ও যুক্তি উভয়টিই চিন্তা থেকে আসে, তা সত্ত্বেও বিশ্বাস কেন যুক্তির চেয়ে বড়? কিংবা যুক্তি কেন বিশ্বাসের সামনে মূল্যহীন? এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, চিন্তা যখন বিশ্বাসের পথ দেখায় সে নির্ভর করে জ্ঞানের উপর, অন্যদিকে যুক্তির ক্ষেত্রে চিন্তা নির্ভর করে দৃষ্টিশক্তির উপর। বিশ্বাস চিন্তা থেকে আসে কিন্তু সে চিন্তার উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যদিকে যুক্তি সম্পূর্ণরূপেই চিন্তার উপর নির্ভরশীল।

যুক্তিবাদীরা নির্ভর করে চিন্তার উপর, আর চিন্তাশীলরা নির্ভর করে জ্ঞানের উপর। যুক্তিবাদীদের দৃষ্টিতে মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে চিন্তাশক্তি। কিন্তু জ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে বড় অস্ত্র জ্ঞান। এটা কেউ অস্বীকার করবে না যে, জ্ঞানের অবস্থান নিশ্চয়ই চিন্তা বা যুক্তির চেয়ে উপরে। চিন্তা স্বয়ং জ্ঞান 'নয়', জ্ঞানের রাজ্যের একজন সৈনিক মাত্র। তার উপর জ্ঞান নির্ভর করে না, জ্ঞান তাকে পরিচালনা করে। একইসাথে বিশ্বাসকেও পরিচালনা করে জ্ঞান। যুক্তি চিন্তার উপর নির্ভরশীল হওয়া মানে জ্ঞানের অধীনস্ত একজন সৈনিকের উপর নির্ভরশীল হওয়া, আর বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল হওয়া মানে জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া।

যুক্তিবাদীদের নিকট চিন্তা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম। বিশ্বাসীদের কাছে চিন্তা জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হওয়া সৈনিক মাত্র। যুক্তিবাদীরা চিন্তাকে সত্যান্বেষণের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী সহায়ক মনে করে। বিশ্বাসীরা মহাসত্য থেকে পাওয়া অসীম জ্ঞানের আলোয় সত্যকে খুঁজে।

চিন্তা ভুল করতে পারে, কারণ সে নির্ভরশীল দর্শনের উপর। জ্ঞানের অধীনস্ত হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা ভুল পথে চলে যায়, যদি ব্যক্তির জ্ঞানের রাজ্যে শৃঙ্খলা না থাকে। যার ভিতরের জ্ঞানসত্তা তার অজ্ঞতার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তার জ্ঞানরাজ্যে শৃংখলা থাকে না। তার সৈনিকরা তাকে মানে না। তখন বিশ্বাসও ভুল পথে চলে যায়।

বিশ্বাসীদের বিশ্বাস সঠিক পথে থাকে, কারণ তাদের বিশ্বাসকে পরিচালনা

করে অসীম জ্ঞানশক্তি। যুক্তিবাদীদের চিন্তা ভুল করে, কারণ তাদের চিন্তার সাথে অসীম জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। চিন্তার উপর নির্ভরশীল হওয়া, অথচ চিন্তার উৎসকেই না জানা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীর কাজ নয়।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণা অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে মুমিনের মূল চারটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- দেখা, শোনা, চিন্তা করা এবং অনুধাবন করা। যেমন-

إن في ذلك لآية لقوم ينظرون

(এতে নিদর্শন রয়েছে দর্শন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য)

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون

(এতে নিদর্শন রয়েছে শ্রবণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য)

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

(এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য)

إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

(এতে নিদর্শন রয়েছে অনুধাবন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য)

এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলোর দ্বারা জানা, বুঝা, চিন্তা করা এসবের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আয়াতগুলোর আলোকে বুঝা যায় একজন মুমিনের মূল গুণ হওয়া উচিত এগুলো। উক্ত আয়াতগুলোতে آية শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون (এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য)- আয়াতে آية শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করে উক্ত সকল গুণকে একত্র করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে দেখা, শোনা, জানা, চিন্তা করা মূলত বিশ্বাসীদের গুণ। বিশ্বাসীদের চিন্তাই প্রকৃতপক্ষে চিন্তা। অবিশ্বাসী যুক্তিবাদীদের চিন্তা মূলত চিন্তা নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয় 'বিশ্বাস'। তাহলে যুক্তির উপর নির্ভর করার কি মূল্য থাকতে পারে?

শুধু চোখে দেখা জিনিসের উপর বিশ্বাস কেন অসম্পূর্ণ?

এর উত্তর এক কথায় দেয়া যায়, শুধু চোখে দেখার নামই দর্শন নয়। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, দর্শন চিন্তাকে পথ দেখায়, আর চিন্তা বিশ্বাসকে। যেহেতু চোখের দেখা মানেই দর্শন নয়, সুতরাং, এর উপর নির্ভরশীল বিশ্বাসও প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস নয়।

সুতরাং, যারা চোখের দেখার উপর নির্ভরশীল বিশ্বাস নিয়ে যুক্তিকে ব্যবহার করে, তারা সত্যানুসন্ধানী নয়। তাদের যুক্তি নিয়ে বিশ্বাসীদের মাথাব্যাথার কিছু নেই। পাল্টা যুক্তি দিয়ে অবিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাসের বীজ বপন করার চেষ্টারও কোন অর্থ নেই। বিশ্বাসের ভ্রান্তি দূর করার ক্ষমতা যুক্তির নেই। যুক্তিবাদীদের যুক্তির স্তরভেদ আছে। একেকজনের যুক্তির তীক্ষ্মতা একেকরকম। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে জয় করার চেষ্টার ফলাফলও একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরম হবে। তবে বিশ্বাসের কোন স্তরভেদ নেই। বিশ্বাস চিরন্তন। যা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তা যুক্তির আঘাতে কোনদিন কুপোকাত হবে না, তাকে পুনরায় যুক্তির মোড়কে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও অর্থহীন।

অথবা যদি অন্তর্চক্ষুর দেখা জিনিসের (যাকে পূর্বের আলোচনায় দর্শন বলা হয়েছে) উপরও নির্ভর করে বিশ্বাস করা হয়, তবুও তা অসম্পূর্ণ। কারণ এ ক্ষেত্রে তাকে চিন্তা ও বিশ্বাসের গন্ডি পার হয়ে সত্যের কাছে যেতে হবে। দর্শনের কাছে যা সত্য মনে হবে চিন্তার কাছে তা মনে নাও হতে পারে, আবার চিন্তাকে বিশ্বাস সমর্থন নাও দিতে পারে। যদি দর্শনের দেখা ফলাফলটি চূড়ান্তভাবে সত্য হয় সেটা সফলতা। কিন্তু এ পথে সত্যের সন্ধান শুধু দর্শন দিতে পারে না, সে চিন্তা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল বলেই এ বিশ্বাস অসম্পূর্ণ।

যুক্তি-তর্কে জ্ঞানের বিস্তার কতটুকু ঘটে?

বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তি অর্থহীন- এ কথা মেনে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু অবিশ্বাসীদের পাল্টা যুক্তি দেয়া কি করে অর্থহীন হতে পারে? যে সকল বিশ্বাসী যুক্তিবাদীরা অবিশ্বাসীদের পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে বক্তব্যের মঞ্চ এবং লেখনীর হাত উভয়টিকেই সফলভাবে ব্যবহার করছেন তাদের এ কাজ কি অর্থহীন?

মানুষ সসীম জ্ঞানের অধিকারী। সে হোক বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী। অসীম জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া অবিশ্বাসীদের কাজ নয়। কিন্তু বিশ্বাসীদের সসীম জ্ঞান অসীমের সামনে সদা সমর্পিত। তাদের জ্ঞান সসীম হলেও অসীমের সন্ধান লাভ করে থাকে, বিশ্বাস সঠিক পথে থাকার ফলেই। যুক্তিবাদীরা এ ক্ষেত্রে অসীমের সন্ধানলাভে অক্ষম। তারা চেষ্টা করবে সসীম জ্ঞানের সীমার ভিতরে থেকে তাদের জ্ঞানের সর্বোচ্চটা জাহির করার। সে ক্ষেত্রে সকলের যোগ্যতা সমান নাও হতে পারে। একজন যুক্তিবাদী যুক্তির বিচারে একজন বিশ্বাসীর চেয়ে বেশি যোগ্যতার হতেই পারে। যদি হয় সেটা সকলে চাক্ষুষ দেখবে। কিন্তু যে জ্ঞানের বিচারে একজন বিশ্বাসী যুক্তিবাদীর চেয়ে হাজারগুণ এগিয়ে সে জ্ঞান চাক্ষুষ নয়। সেটা অবিশ্বাসীকে কোনদিন বুঝানোও সম্ভব নয়। সুতরাং, তাদের সামনে পাল্টা যুক্তি দেয়া অর্থহীন।

অন্যদিকে যদি বিশ্বাসী ব্যক্তি যুক্তিকে ব্যবহার করে সফল হয়েও থাকেন, সেটা একসময় তার মধ্যে বিশ্বাসের চাইতে যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়ার চিন্তা জন্ম দেবে। সে মুহূর্তে তিনি অসীম জ্ঞানের পরশ থেকে ছিটকে যাবেন। যদি কেউ যুক্তির বলে অবিশ্বাসীকে পরাজিত করে থাকেন, সেটা প্রতিপক্ষের দূর্বলতার কারণেই হয়েছে। একটা সময় প্রতিপক্ষ অপরাজেয় পাল্টা যুক্তি দিতেই পারে। সে ক্ষেত্রে নিজের যুক্তি হয়তো যথেষ্ট হবে না। নিজের বিশ্বাসকে সঠিক পথে রাখতে চাইলে যুক্তির নির্ভরতা ত্যাগ করতে হবে। বিশ্বাসের সাথে যুক্তির তুলনা হয় না।

এ ক্ষেত্রে আরো বলা প্রয়োজন যে, ইসলাম যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, যদিও ইসলামের সবকিছুই যৌক্তিক। ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে বিশ্বাসের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) বিশ্বাসের দাওয়াত দিয়েছেন। যুক্তিতর্কের আয়োজন করে কাফেরদের পরাজিত করেন নি। বিশ্বাসের বলেই অসংখ্য মানুষ তার দাওয়াত গ্রহণ করেছেন।

অবিশ্বাসীকে যুক্তির অস্ত্রে পরাজিত করা সম্ভব নয়। কারণ এ অস্ত্র তারও আছে। শত্রুকে পরাজিত করার জন্য তার মত একই অস্ত্র ব্যবহার করলে, তাতে যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বীতা বাড়তে পারে বৈকি, যুদ্ধ জয় করার সম্ভাবনা অনেক কম। যুদ্ধ জয় করতে হলে সে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে, যা তার নেই।

শত্রু যদি একই অস্ত্র ব্যবহার করে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে, তবে সেটাও প্রকারান্তরে শত্রুর সফলতাই। যুক্তি দিয়ে অবিশ্বাসীকে পরাজিত করা কোন সফলতা নয়। তাদের কাছে যে অস্ত্র নেই, তা হলো বিশ্বাস। বিশ্বাসের বলেই মুসলমানরা অজেয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। বিশ্বাসের বলেই তারা বদলে দিয়েছিলেন মানবতাকে।

জ্ঞানের শক্তি: অতীত

জ্ঞানের শক্তি ও মাহাত্ম্য কি?

জ্ঞানের শক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কোন জ্ঞানহীনের কাজ নয়। তারা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথার পুনরাবৃত্তি করতে পারে মাত্র। জনৈক দার্শনিক বলেন, "কেউ আমাকে বলুক, যে জ্ঞানকে পায়নি, সে কি পেয়েছে? আর যে জ্ঞানকে পেয়েছে, তার আর কি পাওয়ার বাকি আছে?"। জ্ঞান যদি কারো মনে এ অনুভূতির জন্ম দিতে পারে, তাহলে তার শক্তি অনুমান করার জন্য আর কি-ই বা প্রয়োজন!

জ্ঞানের বলে মানুষ নিজেকে যদি সবচেয়ে ধনী মনে করে এ দৃষ্টিতে যে, আমি যা অর্জন করেছি, তার পরে কিছু অর্জন করার থাকে না, সুতরাং, আমার কোন অভাব নেই, আমার চেয়ে ধনী আর কে আছে?- এ ভাবনা তার জন্য অহংকার হবে না। তার মত আরো শত জ্ঞানী একই কথা ভাবুক তারা অহংকারী বলে গণ্য হবেন না। অহংকার কি তারা খুব ভালো করেই জানেন। জ্ঞান তাদেরকে শুধু এটা অনুভব করতে শেখায় যে, জ্ঞানই সব। পৃথিবী চলছে জ্ঞানের শক্তিতে, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে জ্ঞানের স্বল্পতায়, পৃথিবী নিঃস্ব হয়ে যাবে যেদিন জ্ঞান চিরবিদায় নেবে।

যে ব্যাক্তির আর্থিক অভাব আছে, জ্ঞান হবে তার ধন, যার ধন আছে, জ্ঞান হবে তার অঙ্গসজ্জা। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "কোন বস্তু সঞ্চয় করা উচিত? তিনি উত্তর দিলেন, যা নৌকা ডুবে গেলেও তোমার সাথে সাতার কাটবে।" অর্থাৎ, নৌকা ডুবে ব্যক্তির সলিল সমাধি হয়ে গেলেও জ্ঞান তার সাথে থেকে যাবে। জ্ঞানকে সাথে নিয়ে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তিরা মৃত্যুর কষ্ট টের পান না।

জ্ঞানের শক্তি ও মাহাত্ম্যের ব্যাপারে ইতিহাস কি বলে? প্রশ্নটি এজন্যই যে, ইতিহাস যাকে গ্রহণ করে নি, নতুন গবেষণা দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থহীন।

এখানে একাধিক বিষয় চলে এসেছে। প্রথমত, জানা দরকার ইতিহাস কি? ইতিহাসের উৎপত্তি কিভাবে? দ্বিতীয়ত, ইতিহাস যাকে গ্রহণ করে নি তাকে নতুন গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত করার কোন অর্থ হয়না- কেন?

আলোচনাটি একটু অন্যভাবে করা যাক। যদি প্রশ্ন করা হয়, পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের সূচনা কিভাবে? ভাষার জন্ম কিভাবে? সামাজিকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি এসবের সূচনা কিভাবে?- সকল কিছুর উত্তরেই যা বলা হবে, তা হবে তার 'ইতিহাস'। মানুষের অস্তিত্ব লাভের কথাগুলো মানুষের ইতিহাস, ভাষার সূচনার গল্পকে বলা হবে ভাষার ইতিহাস, সকল কিছুর সূচনার গল্পই ইতিহাস হিসেবে সংজ্ঞায়িত হবে। তাহলে ইতিহাসের সূচনা কোথায়? ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোন সূচনাকাল যদি মানবজাতির হাত ধরেই হয়ে থাকে, কিংবা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি ইতিহাসের প্রবর্তক হয়ে থাকে, তাহলে মানবজাতির উৎপত্তির গল্পকে কি বলে অভিহিত করা হবে? 'ইতিহাস'? নাকি অন্যকিছু?

আলোচনার ধারাটা এভাবে এজন্যই আনা যে, আমরা ইতিহাস বলতে যা বুঝি তা মূলত ইতিহাস নয়। ইতিহাস তা নয় যার দ্বারা অতীতকে জানা যায়। ইতিহাস তাই যা অতীতকে শুধু ধারণই করে না, অতীতের মানদণ্ডে মেপে বর্তমানের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়, ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে দেয়। কারণ ইতিহাস কোন মানুষের মনগড়া সৃষ্টি নয়। কারো স্বাধীন চিন্তার ফসলও নয়। ইতিহাসের জন্ম স্বয়ং জ্ঞানের হাত ধরে। ইতিহাস জ্ঞানকে অস্বীকার করলে নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হবে।

জ্ঞানের সূচনা যখন থেকে ইতিহাসের সূচনা তখন থেকেই। সৃষ্টিজগতের সকল কিছু আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। কিন্তু জ্ঞান সৃষ্টি নয়, ইতিহাস সৃষ্টি নয়। এগুলো চিরন্তন। এজন্যই ইতিহাস যাকে গ্রহণ করে নি, তাকে নতুন গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা অর্থহীন।

ইতিহাস কি বলে? প্রশ্নটির দ্বারা হয়তো গৎ বাধা গল্পের মতো উত্তর আশা করা হয়েছে, যেখানে জ্ঞানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অতীতের কারো বলে যাওয়া কথাকে উল্লেখ করা হবে। কিন্তু না! সেটা ইতিহাসের কাজ নয়, ইতিহাসের কাজ মানুষকে এটা উপলব্ধি করানো যে, সৃষ্টিজগতের শুরু থেকে আজ অবধি যা কিছু হয়েছে, সকল কিছুর সূচনা জ্ঞান থেকে, এমন কি তার নিজেরও।

বর্তমান দুনিয়ায় অনেক মতবাদ, অনেক চিন্তাধারা, অনেক গবেষণা মানুষের সামনে অনেক কিছুকেই নতুন করে উপস্থাপন করছে যেগুলো ইতিপূর্বে মানবসভ্যতা কখনো দেখে নি। এগুলো সামনে আসার ফলে মানুষ নতুন করে নানা কিছু ভাবতে শিখছে। এ সকল নতুন কিছু মানুষকে এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, এতদিন দুনিয়া পিছিয়ে ছিল, সভ্যতার উন্নতি হয়েছে। তাই এখন এমন অনেক কিছুই জানা সম্ভব, যা আগে মানুষ জানত না। হ্যাঁ, কথা

সত্য। কিন্তু সকল নতুন কিছুই কি সঠিক? এমন কি কিছু নেই যা ইতিপূর্বে কেউ করেছে, কিন্তু ইতিহাস সেটাকে গ্রহণ করে নি? সকল ক্ষেত্রেই কি নতুন কিছু জানা মানে সত্যের সন্ধান পাওয়া?

মনে রাখা ভালো, সত্য সহজলভ্য নয়। একে কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয়। নতুন দুনিয়ায় সহজলভ্য কিছু পাওয়া মানেই নতুন সত্য জানা নয়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় সবকিছু সহজলভ্য হওয়ার আরেক অর্থ 'মিথ্যা' ও 'অজ্ঞতা'ও সহজলভ্য হয়ে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে চিরন্তন ইতিহাস মানুষকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জ্ঞানের শক্তি চিরন্তন, মহাকালের সীমানা শেষ হলেও এর সীমানা শেষ হবার নয়। তাই নতুন কিছুকে ইতিহাসের আলোয় বিচার করে সত্যানুসন্ধান করাই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মাহাত্ম্য। জ্ঞানের শক্তি এখানেই নিহিত।

জ্ঞানের শক্তি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে না হয় জানা হলো, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিদের অবদান কি? ইতিহাস এ ক্ষেত্রে কি বলে?

জ্ঞানী ব্যক্তিদের অবদানের কথা বলতে গেলে কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের কথা স্মরণ করতে হয়। যেখানে তিনি বলেছেন- তিনি তাদেরই দলে যারা কর্মী নন ধ্যানী। যারা জাতির কল্যাণ করেন সেবার মাধ্যমে। যারা থেকে যান শিরার আড়ালে প্রবাহমান রক্তের মত। যাদের উপস্থিতি নিয়ে কেউ ভাবে না, কিন্তু অনুপস্থিতির অভাব ঠিকই টের পাওয়া যায়।

রক্ত শরীরকে চালাতে পারে না। আবার রক্ত ছাড়া শরীর অচল। জ্ঞানী ব্যক্তিরা পৃথিবীকে পরিচালনা করেন না, কিন্তু তারা না থাকলে পৃথিবীও চলবে না।[৪১] জ্ঞান পৃথিবীকে পরিচালনা করার জন্য তাদেরকে নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করে। জ্ঞানের শক্তি চিরন্তন। তা কোনদিন ধ্বংস হবে না। কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস হবে। কারণ পৃথিবী মানুষের জন্য। মানুষ যেদিন পৃথিবীকে পরিচালনা করার শক্তিকে হারিয়ে ফেলবে সেদিন আর পৃথিবী থাকবে না।

পৃথিবীতে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আছেন বলেই জ্ঞানহীনরা বেঁচে আছে। জ্ঞানীদের জন্যই বৃষ্টি হয়। জ্ঞানীদের জন্যই গাছ-পালা ফুল-ফলে সুশোভিত হয়। জ্ঞানীদের জন্যই পশু-পাখিরা প্রকৃতিকে মুখরিত করে তোলে। জ্ঞানীদের জন্যই সাগরগর্ভে মৎস্যকুল ছোটাছুটি করে।

এবার আসা যাক ইতিহাসের আলোচনায়-

ইতিহাসের পালাবদল হয়েছে নানাভাবে। সভ্যতার স্থানান্তর ঘটেছে বিজয়ীদের হাত ধরে। কোন অভিযাত্রীর পদধূলিতে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন ভূমি। পর্যটকদের ক্লান্তিহীন পদচারণায় সমৃদ্ধ হয়েছে ইতিহাস ও সংস্কৃতি। সভ্যতার অগ্রযাত্রা ঘটেছে গবেষকদের নতুন আবিষ্কারের হাত ধরে। কিন্তু সকল কিছুর পিছনেই রয়ে গেছে জ্ঞান-সাধনা। সকল বিজয়-অভিযানই সাফল্যের মুখ দেখে নি, সকল অভিযাত্রীর ভ্রমণই ইতিহাস হয়ে থাকে নি, সকল পর্যটকের অভিজ্ঞতাই সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে নি। সকল আবিষ্কারই মানুষের কল্যাণে আসে নি। সেগুলোই সফল হয়েছে, যেগুলোতে ছিল জ্ঞানের ছাপ। অন্যথায় তা হারিয়ে গেছে ইতিহাসের আড়ালে।

---

৪১. হাসান বসরী (রহ.) এর উক্তি- জ্ঞানীরা না থাকলে মানুষ চতুষ্পদ জন্তু হয়ে মারা যেত।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের অবদানের ব্যাপারে ইতিহাস কি বলে?- এ প্রশ্নের উত্তর অনেকটা পূর্বোক্ত আলোচনার মতোই। নির্দিষ্ট করে জ্ঞানী ব্যক্তিদের নাম আর তাদের অবদান উল্লেখ করতে গেলে শেষ হবে না। কিন্তু তাতে প্রকৃতপক্ষে তাদের অবদানকে অনুধাবন করা হবে না। তাদের অবদানকে অনুধাবন করতে হলে, ঘুরতে হবে ইতিহাসের প্রতিটি অলিতে-গলিতে। জানতে হবে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার পিছনে জ্ঞানীদের পরোক্ষ প্রভাব। এমন অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে যুদ্ধে বিজয়ীরা পা রেখেছেন বীরের বেশে। কিন্তু তার পিছনে প্রকৃত শক্তি হিসেবে আড়াল রয়ে গেছেন কোন জ্ঞান-সাধক। কোন প্রজন্মের তরুণেরা হয়ত বিপ্লব করেছে তাদের তারুণ্যের শক্তিতে, কিন্তু তাদের মনে শক্তি যুগিয়েছে কোন জ্ঞানীর লেখনী। জ্ঞানীদের অবদান বুঝতে সে সকল জায়গায় চোখ বুলানো প্রয়োজন, যেখানে জ্ঞান ব্যতীত সবকিছু অক্ষম।

যেখানে জ্ঞান ব্যতীত সবই অক্ষম

জ্ঞানই যদি সকল কিছুর মূল হয়ে থাকে তাহলে এমন কি ক্ষেত্র আছে, যেখানে জ্ঞান ব্যতীত সবই অক্ষম?

এর উত্তর হচ্ছে আদর্শ। কোন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। ইতিহাস এ প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে দিয়েছে। ইসলাম তরবারির জোড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হয়েছে আদর্শের জোড়ে, যাকে পরিচালিত করেছে জ্ঞান। যেখানে তরবারির লড়াই প্রয়োজন ছিল, সেখানে তরবারির লড়াই হয়েছে। যেখানে তরবারি ব্যর্থ, সেখানে আদর্শ জয়লাভ করেছে।

পারস্য-অভিযানে মুসান্না ইবনে হারেসা (রা.) মুজাহিদদের জন্য সমর-প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা রাখতেন। প্রতিটি দলের জন্য নির্দিষ্ট মুবাল্লিগ থাকতেন যাদের কাজ ছিল মুজাহিদদের দ্বীনি চেতনা বজায় রাখা। সেই সাথে প্রতিটি বিজিত অঞ্চলে নও মুসলিমদের নৈতিক সংশোধন ও তাদের মাঝে দ্বীনি জ্ঞান বিতরণের জন্যও রাখতেন আলাদা একটি দল। সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী (রহ.) যুদ্ধের পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতেন। তার বাহিনীতেও আলেমদের একটি দল থাকত মুজাহিদদের চাঙ্গা রাখার জন্য। সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযানের সময় প্রতিটি যুদ্ধের পূর্বেই তার আধ্যাত্মিক গুরু শায়খ আবুল হাসান কিরখানী (রহ.) এর পরামর্শ নিতেন।

অমুসলিমদের কথা যদি আলোচনা করা হয়, নেপোলিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রেও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মিশর জয় করার পর তার প্রচেষ্টায় জ্ঞান ও প্রযুক্তির যতটা প্রসার সেখানে হয়েছে, তার অবদান মুসলমানরা আজও স্বীকার করে।

শত্রুর তরবারির আঘাত তরবারি দিয়ে প্রতিহত করা সম্ভব। আদর্শের উপর আঘাত আসলে তাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা জ্ঞান ছাড়া কারোর নেই।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিসেবে তাতারীদের ইতিহাস উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলমানদের উপর তাতারীদের আক্রমণের সময় মুসলমানরা সমর-শক্তিতে মোটেও পিছিয়ে ছিল না। যদিও চেঙ্গিস খানের সমর-কৌশল ছিল অভিনব, তবুও তারা এতটা শক্তিশালী ছিল না যে, মুসলমানরা তাদের

কাছে এতটা পর্যদুস্ত হবে। ইতিহাসবিদগণ এই হৃদয়-বিদারক ইতিহাসের জন্য মুসলমানদের বিলাসিতা, দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়া- এই কারণগুলোকেই দায়ী করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সে জাতিকে হেফাজত করেন না, যারা নিজেদের হেফাজত করে না। তাদের অবস্থা তাই হয়েছিল। কিন্তু সেই ধ্বংসস্তুপ থেকে মুসলমানদের উত্থান কিভাবে ঘটল?

মামলুক শাসনামলে মিশরের প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশেও জন্ম নিয়েছেন এমন অনেকেই যারা মুসলমানদের অস্তিত্বকে রক্ষা করলেন জ্ঞানের হাতিয়ার ব্যবহার করে। তাতারীদের পরাজিত করার প্রধান কারিগর সাইফুদ্দীন কুতয (রহ.) এদেরই একজন। 'তাতারীদের ইতিহাস' বইতে ড. রাগেব সারজানী তাতারীদের বিপক্ষে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন- তৎকালীন মিশরে আল্লাহ তায়ালা দুটি নিয়ামত দিয়েছিলেন, একটি জ্ঞান অপরটি দ্বীনি চেতনা।

জ্ঞানহীনতার ভয়াবহতা: বর্তমান

জ্ঞানহীনতার ফল কতটা ভয়াবহ হতে পারে?

জ্ঞান না থাকার ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। জ্ঞানের অভাব বুঝতে পারাটাও জ্ঞানের অবদান। এ জ্ঞান না থাকলে অবস্থা কি দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। দেহ যেমন খাদ্যের অভাবে মারা যায়, অন্তর তেমনি জ্ঞানের অভাবে মারা যায়। জ্ঞানবিহীন অন্তর এতটাই মৃত যে, সে নিজের মৃত্যুও টের পায় না। জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানহীনদের চিনতে পারেন, কারণ তার চেনার জ্ঞান আছে। অন্যদিকে মুর্খ জ্ঞানীকে চিনতে পারে না, কারণ তার সে জ্ঞান নেই। জ্ঞান না থাকাটা জ্ঞানহীনদেরকে কতটা নিঃস্ব করে দেয়, ভাবা যায়!

জ্ঞানের অভাবের যথেষ্ট উদাহরণ এ যুগে পাওয়া যায়। অতীতকে ভুলে যাওয়া, বর্তমানকে বোঝার চেষ্টা না করা, ভবিষ্যতের ব্যাপারে অপরিণামদর্শীতা, জ্ঞানের অবমূল্যায়ন, জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জ্ঞান না থাকা, ইত্যাদি গুরুতর সমস্যা নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। জীবন চলে যাচ্ছে। কিন্তু জানিনা এর ভয়াবহতা কতটা মারাত্মক হতে পারে।

জ্ঞানহীনতার কিছু ভয়াবহ দিক সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যাক।

জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অভাব কতটা?

সক্রেটিসের একটি উক্তি- **"সত্যিকারের জ্ঞান আমাদের সবার কাছেই আসে, যখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা আমাদের জীবন, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে এবং আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সম্পর্কে কত কম জানি।"**

জীবন কি? আমরা জানিনা, অথচ বেঁচে আছি। জীবন কেন? সেটাও জানি না, তবুও জীবন একভাবে চলে যাচ্ছে। আমাদেরকে জীবন কেন দেয়া হলো? কে দিল? সে ভাবনা আমাদের নেই, তবুও জীবন চলে যাচ্ছে। জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? সে লক্ষ্য কতটা অর্জন হচ্ছে?- সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা বাস্তব জগত থেকে যোজন যোজন দূরে, তবুও জীবন চলছে। এরকম হাজারো সমস্যা পাওয়া যাবে, যা সামনে আসলে বুঝা যাবে আমাদের জ্ঞানের দৌড়। কিন্তু তাতে কি হবে? জীবন যাপনের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কতটা, সেটাই অনুভব করার শক্তি আমাদের নেই। চিন্তাশক্তি পতনের এতটাই গভীরে গিয়ে ঠেকেছে।

দুনিয়ার জীবনে কোন কিছুই নিশ্চিত নয়। ভাগ্য একটা বড় প্রভাবক, যা না মেনে উপায় নেই। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত। তা হলো মৃত্যু। ছাত্রজীবন, কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানান 'অনিশ্চিত' বিষয়ের জন্য আমদের আপ্রাণ চেষ্টা চলমান। কিন্তু সবচেয়ে নিশ্চিত পরিণতির জন্য কোন পূর্ব-প্রস্তুতি নেই। তা হলে আমরা কি করে দাবী করতে পারি যে, আমরা জীবনকে বুঝি!

দুনিয়ার জীবনে নানা ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টার কমতি থাকে না। অথচ শেষ পরিণতি সফল করার জন্য কতটা চেষ্টা থাকা উচিত, তা নিয়ে কখনো ভাবি না। তাকে সফল করার পরিকল্পনাও কখনো করি না, সে লক্ষ্যে কতটা এগিয়ে গেলাম কিংবা লক্ষ্য থেকে কতটা দূরে সরে গেলাম সে ভাবনাও নেই, তাহলে আমরা কি করে দাবী করতে পারি যে, আমরা জীবনকে বুঝি!

জীবনকে না বুঝে জীবন যাপন করা 'জীবিত'দের কাজ নয়। এজন্যই বলা হয়েছে, জ্ঞানী ব্যতীত বাকি সবাই মৃত। নিজেকে মৃত বলে যেদিন উপলব্ধি করতে পারবো, সেদিনই কেবল জীবিত হব।

অতীতকে আমরা কতটা জানি? তা থেকে কতটা শিক্ষা গ্রহণ করি বর্তমানকে বোঝার জন্য? আর ভবিষ্যত সম্পর্কেই বা কি ভাবি? এসব ক্ষেত্রে আমাদের জানার অপূর্ণতা কতটা? এ অপূর্ণতার ফলাফল কি হতে পারে?

সময়কে বোঝার জন্য চাই অসীম জ্ঞানের পরশ। সেটা অতীত হোক, বর্তমান হোক আর ভবিষ্যতই হোক। কারণ সময় এমন জিনিস যার ব্যাখ্যা সসীম জগতের জ্ঞান দিতে পারবে না। সময়ের ব্যখ্যা সসীম জগত দিতে পারবে না তার আরেকটি কারণ হচ্ছে, সসীম জগতই সময়ের শেষ সীমা নয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত তিনটির কোনটিকেই সসীম জ্ঞানের দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। যদি কেউ দাবী করে থাকে সময়ের নিখুত ব্যাখ্যা সসীম জগতের জ্ঞান দ্বারাই দিতে পারবে, তাহলে প্রশ্ন থাকলো-

"অতীত কবে শুরু হয়েছিল, বর্তমানের স্থায়িত্ব কতটুকু আর ভবিষ্যত কবে শেষ হবে?"

এই প্রশ্নের উত্তর না দেয়াটাই মূলত 'সঠিক' উত্তর। সময়ের জ্ঞান সেখান থেকেই নিতে হবে যার বিস্তৃতি অসীম। যা অতীত নামক জিনিসটির সূচনার আগে থেকেই ছিল, বর্তমান যাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না, ভবিষ্যত শেষ হওয়ার পরও যা থেকে যাবে। অর্থাৎ সকল জ্ঞানের আধার পবিত্র কুরআন। একমাত্র এই উৎস থেকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঠিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব।

এখন পূর্বের প্রশ্নটি নিজেরাই নিজেদের করি। তাহলে উত্তরটাও নির্ভরযোগ্য হবে।

এবার দেখা যাক সময় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতার ভয়াবহতা কেমন হতে পারে-

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মহাকালের শপথ করে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে উল্লেখ করেছেন।[৪২] তবে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল ব্যতীত। পূর্বে আলোচিত হয়েছে, ঈমানী শক্তির মূল উৎস জ্ঞান। কথাটির সামান্য ব্যখ্যা দেয়া যাক-

ঈমান শব্দের একটি অর্থ বিশ্বাস, অপর আরেকটি অর্থ নিরাপত্তা। উভয়

---

৪২. সূরা আসর। মহাকালের শপথ করার তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ সময় সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশি অসচেতন, বিশেষ করে যে সময়টাকে অসৎ কাজের মাধ্যমে নষ্ট করে।

অর্থ একত্র করলে ঈমানের সংজ্ঞা কি দাঁড়ায়?- জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির মতে, "ঈমান হচ্ছে নিজের বিশ্বাসকে যাবতীয় মিথ্যা ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপত্তা দেয়া।" অন্যভাবে বলা যায়, "আল্লাহর সত্তাকে বিশ্বাসের ত্রুটি থেকে নিরাপত্তা দেয়া।" আল্লাহর সত্তাকে নিরাপত্তা দেয়া জ্ঞানীর কাজ। এজন্যই যাদের বিশ্বাসের কাছে আল্লাহর সত্তা নিরাপদ নয়, তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪৩] তারা একইসাথে নিজের উপর এবং আল্লাহর সত্তার উপর জুলুম করে। সুতরাং, জ্ঞানী ব্যতীত সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত।[৪৪]

জ্ঞানের মূল্যায়ন আমরা কতটুকু করি? জ্ঞানের অবমূল্যায়নের ফলাফল কি হতে পারে?

জ্ঞানকে আমরা কতটা মূল্যায়ন করি সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সহজ উপায় হচ্ছে নিজেদের এই প্রশ্ন করা যে, আমরা পূর্ববর্তী জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে কতটা জানি। তাদেরকে কতটা অনুসরণ করি। কারণ, পৃথিবীতে ধীরে ধীরে জ্ঞানের অবনতি হয়েছে। পূর্বের জ্ঞানীদের মূল্যায়ন না করে নিজেদের জ্ঞানের উপর আস্থা রাখা বোকামি। একইসাথে সমসাময়িক জ্ঞানী ব্যক্তিদের মূল্যায়ন না করাটাও জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।[৪৫]

জ্ঞানের মূল্যায়ন না করা, জীবন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলোর কারণে আমাদের জন্য ভবিষ্যতে কি ধরণের বিপদ অপেক্ষা করছে?

মহাকাল কখনো অজ্ঞতার অন্ধকারকে প্রশ্রয় দেয় না। যে যুগেই অজ্ঞতা মানবস-ভ্যতার উপর হানা দিয়েছে, সে যুগেরই সমাপ্তি ঘটেছে জ্ঞানী ব্যক্তিদের হাতে। জ্ঞানের হাত ধরে বেড়ে উঠেছে নতুন প্রজন্ম। আর ইতিহাসের গর্ভে সে অজ্ঞ জাতি হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। জাহেলী যুগের ইতিহাস, রোম-পারস্যের ইতিহাস আর তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস শুধু সে যুগের ভয়াবহতা উপলব্ধির জন্যই জানা হয়। সে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার কিছু

---

৪৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী- إن الشرك لظلم عظيم (নিশ্চয়ই শিরক একটি মহা জুলুম)

৪৪. সূরা আসরে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত বলাটা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝার জন্য সাহাবায়ে কেরামের আমল লক্ষ্য করাই যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরাম এই সূরা নাযিল হওয়ার পর যখনই কারো সাথে সাক্ষাত করতেন, বিদায় নেয়ার পূর্বে এই সূরা তেলাওয়াত করে বিদায় নিতেন। (ইবনে কাছির)। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে এই সূরা অনুধাবন করলে মানুষের আর কিছু প্রয়োজন নেই।

৪৫. ইমাম কুরতুবী রহঃ এর মতে, সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের অবহেলা যারা করে তারা ভ্রান্ত ৭২ ফেরকার অন্তর্ভুক্ত।

নেই। শিক্ষা একটাই, এরকম যুগের ধ্বংস নিশ্চিত। অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়ার মত প্রজন্ম যখন পৃথিবীতে থাকবে না, তখনই শেষ হয়ে যাবে মানবজাতির সময়সীমা।

আমাদের প্রজন্ম থেকে যদি জ্ঞান সাধক তৈরি না হয়, সে ক্ষেত্রে মানবসভ্যতার ধ্বংস নিশ্চিত। যদি তৈরি হয়, সে ক্ষেত্রে মানবসভ্যতা আরও দীর্ঘকাল আলোর মুখ দেখবে, কিন্তু আমাদের ধ্বংস তখনো নিশ্চিত। এমন একটি সময় আসবে, এমন একটি প্রজন্মের হাতে সভ্যতার নিয়ন্ত্রণ থাকবে, যারা আমাদেরকে ইতিহাসের আস্তাকূড়ে নিক্ষেপ করবে। আমাদের মতো জ্ঞানহীনদের স্মরণ করার কোন কারণ নেই।

আমাদের জ্ঞান সাগরে ঝাঁপ দেয়ার অনাগ্রহ আমাদেরকে দিনে দিনে অন্য জাতির গোলামীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ইতিহাসের গৌরবকে কলঙ্কিত করার জন্য আমাদেরকেই দায়ী করবে। সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন আমাদের চিন্তাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে অন্য কেউ। আমরা যা সঠিক বলে ভাববো, তা সঠিক হবে না, কিন্তু ভুল ধরার ক্ষমতা আমাদের থাকবে না। আমাদের নিয়ন্ত্রকরা যা চাইবেন আমরা তাই ভাববো! চিন্তাশক্তিকে যদি জ্ঞানই পরিচালনা করে থাকে তাহলে জ্ঞানের অনুপস্থিতি আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে ভাবা যায়!

ইতিমধ্যেই আমাদের চিন্তাশক্তির অবনতি ঘটতে শুরু করেছে। মুক্তচিন্তার নামে চিন্তাকে ভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়ে তা নিয়ে আবার গর্ব করা হচ্ছে। এ ধরণের চিন্তার অধিকারীরা নিজেরাও জানে না, তাদের চিন্তার নিয়ন্ত্রণ কোথা থেকে হচ্ছে। জীবন সম্পর্কে যাবতীয় অসার ধারণা নিয়ে মানুষ জীবন যাপন করছে, অথচ নিজেরই ধারণা নেই, কোন চিন্তাশক্তি থেকে এসব ধারণা আসছে। তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য নয় কেন? কেনই বা ইতিহাস আমাদেরকে মনে রাখবে?

এবার পূর্বের সমস্ত আলোচনার সারমর্মকে আরো একবার অসীম জ্ঞানের উৎসের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। দেখা যাক কুরআন, হাদীস, কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তি, কারো লিখে যাওয়া পঙক্তি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের প্রচলিত প্রবাদ জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় কি বলে? আর ইতিহাসই বা কি বলে?

পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون –ومالاتبصرون

(তোমরা যা কিছু দেখ আর যা কিছু দেখনা, সবকিছুর কসম)

بصر শব্দের অর্থ গভীরভাবে দেখা, সাধারণভাবে দেখা বুঝাতে আরবীতে نظر বা رؤية শব্দ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এ আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে এমন তোমরা যা কিছু গভীর দৃষ্টিতে দেখ আর যা গভীরভাবে দেখনা, কিংবা যা কিছু দেখেও দেখনা, সকল কিছুর কসম।

এ আয়াতের আরো কিছু অর্থ তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যায়, যেমন- তোমরা যা কিছু দেখ আর যা কিছু দেখনা- এর অর্থ যথাক্রমে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বাহ্যিক ও গোপন রূপ, দেহ ও আত্মা, দুনিয়া ও আখেরাত, মানুষ ও জীন-ফেরেশতা, সৃষ্টি ও স্রষ্টা ইত্যাদি।[৪৬]

আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এবং এটাও বলে দিয়েছেন যে, আমরা যা কিছু দেখি, তার বাইরে রয়ে গেছে না দেখা বিশাল জগত। বাহ্যিক দেখার জগতই যদি সবকিছু হত, তাহলে لا تبصرون (তোমরা যা কিছু দেখ না) বলা হত না। বরং আলাদাভাবে বলার দ্বারা না দেখা জিনিসকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যার অস্তিত্ব নেই, তা নিয়ে শপথ করার কোন প্রয়োজন নেই।

দেখা জিনিসকে গভীরভাবে দেখলে না দেখা জিনিসকেও দেখা যায়। একইভাবে জানা জিনিসকে গভীরভাবে জানলে না জানা জিনিসকেও জানা যায়।

---

৪৬. তাফসীরে রুহুল মাআনী, বাগাবী, তাবারী।

এ আয়াত এটাও প্রমান করে যে, দৃশ্যমান জগত সসীম কিন্তু অদৃশ্য জগত অসীম। একইভাবে এটাও প্রমানিত হয় যে, মানুষের জানার জগত সসীম, কিন্তু তার অজানা জগত অসীম। কেউ যদি নিজেকে প্রশ্ন করে আমার কি জানা উচিত? তার উত্তর হচ্ছে- "তুমি যা জাননা।" যদি প্রশ্ন করে কিভাবে জানব? উত্তর হচ্ছে, "যা জান তা দিয়েই জানবে।"

রাসূল (সা.) এর একটি হাদীস

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন- منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها

(দুই ধরণের লোভী কখনো তৃপ্ত হয় না, (এক) জ্ঞানের লোভী (দুই) দুনিয়ার লোভী)

দুনিয়াকে পাওয়ার ইচ্ছা আর জ্ঞান অন্বেষণের চেষ্টা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বিপরীত মেরুর এ দুই জিনিস কখনো একই ব্যক্তির মাঝে একত্র হতে পারে না। যে দুনিয়াকে পাওয়ার চেষ্টা করে সে জ্ঞানকে পাবে না, আর যে জ্ঞানকে পেতে চায় দুনিয়া তার কাছে মূল্যহীন। দুনিয়ার পিছনে ছোটা ব্যক্তির পিপাসা কখনোই মিটে না। একইভাবে জ্ঞানের পিছনে ছোটা ব্যক্তির পিপাসাও কখনো মিটে না। দুনিয়াকে যে চায় সে অন্ধ, জ্ঞানকে যে চায় সে-ই প্রকৃত চক্ষুষ্মান। একই ব্যক্তি একইসাথে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান হতে পারে না।

দুনিয়ার লোভী যতদিন দুনিয়াতে থাকে ততদিন দুনিয়া তাকে চেনে। জ্ঞানের লোভীকে চেনা শুরু হয় তার বিদায়ের পর। দুনিয়ার লোভী হারিয়ে যায় কালের গর্ভে, তাকে কেউ খোঁজার চেষ্টাও করে না। জ্ঞানের লোভী হারিয়ে যায় জ্ঞান সাগরের অতল গভীরে, তাকে খুঁজতে গিয়ে যুগে যুগে হারিয়ে যায় আরো অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু। হারিয়ে যাওয়ার মাঝেই তাদের আনন্দ।

দুনিয়া অন্বেষণকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বেই তার অতৃপ্তির জ্বালা টের পায়। দুনিয়ার সুখ-শান্তি সে যতই পায়, ততই চায়। সারাজীবন ধরে ভোগ করার পর সে উপলব্ধি করে, এসব ছিল অর্থহীন। তাতে তার সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়ানো অতৃপ্তি আরো বেড়ে যায়।

অন্যদিকে জ্ঞান অন্বেষণাকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বেই পেয়ে যায় কিছু না পেয়েও সবকিছু পাওয়ার অনুভূতি। জ্ঞানের সাগরে যতই অবগাহন করতে থাকে ততই তার মনে হয়, কিছু পাওয়া হলো না। কিন্ত মৃত্যুর পূর্বে তার বিবেক তাকে এটা জানান দেয় যে, আসলে তার সবই ছিল।

মৃত্যুর পূর্বের অনুভূতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখনই কেবল মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে চিনতে পারে। তার এ অনুভূতি কেউ কোনদিন জানতেও পারে না।

মানুষের জীবনের সবচেয়ে সুখের অনুভূতি মানুষ গোপনই রাখে। বলাবাহুল্য, গোপন রাখতে হয়। কারণ এ অনুভূতি প্রকাশ করার ভাষা কারো জানা নেই। দুনিয়ার জীবনে নানা সময় নানা অনুভূতি প্রকাশে যে ভাষা মানুষ ব্যবহার করে, তাতে স্বার্থের ছাপ থাকে। মৃত্যুর পূর্বের অনুভূতি হয় স্বার্থহীন। জগতে স্বার্থহীনভাবে অনুভূতি কিভাবে প্রকাশ করতে হয়, কেউ জানে না। তাই সবচেয়ে সুখের অনুভূতিগুলো গোপন রাখার মধ্যেই প্রকৃত আনন্দ।

দুনিয়ার জীবনে ব্যক্তির কথা ও কাজ পরিপূর্ণভাবে স্বার্থহীন হচ্ছে কি না, তা বিচার করা দুঃসাধ্য। কারণ তখন তার মাঝে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি সত্তাই বিরাজ করে। নিজেকে ভালোভাবে চেনা সারা জীবনেও হয়ে উঠে না। জীবনের একমাত্র নিশ্চিত পরিণতি মৃত্যু যখন সামনে আসে, তখন তার ইতিবাচক সত্তা সক্রিয় হয়ে উঠে। দুনিয়ার জীবনকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা ব্যক্তিও উপলব্ধি করে তার জীবনের অর্থহীনতা।

অন্যদিকে জ্ঞানী ব্যক্তির মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সে এতদিন যার পিছনে ছুটেছে তার পরিণতি অর্থহীন নয় চাই সে জ্ঞানকে কম অর্জন করুক বা বেশি। অসীমের পিছনে ছোটা কখনো অনর্থক হয় না। সেটা উপলব্ধিতে আসে বিদায়ের পূর্বে। দুনিয়ার জীবনে যে যার পিছনেই ছুটুক, কেউই পরিপূর্ণ স্বার্থহীন হয় না। স্বার্থহীনতা প্রমাণ হয় বিদায়ের মুহূর্তে। তাই বিদায়ের পরই পৃথিবী জ্ঞানীদের চিনতে পারে। অন্যদিকে দুনিয়াদারী আদৌ স্বার্থহীন নয় বলে কেউ কোনদিন তাকে নিয়ে ভাবে না।

একটি উক্তি

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) এর উক্তি -

فإن الناس موتى واهل العلم أحياء

(মানুষ মরণশীল কিন্তু জ্ঞানীরা চিরজীবী)

জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের কাজের মাধ্যমে রয়ে যান অমর। তাদের বলে যাওয়া কথা আর করে যাওয়া কর্ম সবই যুগের পর যুগ টিকে থাকে। তবে জ্ঞানীদেরকে চিরজীবী শুধু এ কারণেই বলা হয়নি। বরং তারা জীবদ্দশায়ও দেখিয়ে দিয়ে যান, কিভাবে তারা চিরজীবী। তাদের কথা ও কাজ কালের সীমানাকে অতিক্রম করে যায়। তারা অতীত নিয়ে যা বলেন তা অতীতকে চোখের সামনে এনে দেয়, ভবিষ্যত নিয়ে যা বলেন তা অনাগত ভবিষ্যতের জন্যও পাথেয় হয়ে থাকে। তারা যে কালেই জন্ম নেন না কেন তারা সকল কালের, সকল সময়ের।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, "একজন ভালো বন্ধু একটা লাইব্রেরীর সমান।" হ্যাঁ, লাইব্রেরীর সাথে তুলনা করার অর্থ তিনি জ্ঞানী বন্ধুকেই বুঝিয়েছেন। তা না হলে লাইব্রেরীর অথৈ জ্ঞান সাগরের সাথে মানুষকে তুলনা করার কোন অর্থ নেই।

পূর্বে বলা হয়েছে, জ্ঞান না থাকলে মানুষের আত্মা মরে যায়। মানুষের দেহ মরণশীল, কিন্তু আত্মা অমর। আর জ্ঞানীরা হচ্ছেন সত্যিকারের চিরজীবী আত্মার অধিকারী। সকল আত্মাই চিরজীবী কিন্তু জ্ঞানহীনের আত্মা থাকা আর না থাকা সমান। জ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসলে মৃত আত্মাও জীবিত হয়। জ্ঞানহীনের সাথে থাকলে জীবিত আত্মাও মরে যায়।

প্রশ্ন হতে পারে, **জ্ঞানী আর জ্ঞানহীন একসাথে থাকলে জ্ঞানহীনের উপরই তো জ্ঞানীর প্রভাব পরার কথা। তাহলে তার সাথে থেকে জীবিত আত্মা কেন মরবে?**

শুরুতে আলোচিত হয়েছে, প্রতিটি জিনিসেরই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিক আছে। মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও অজ্ঞতা দুটি দিকই সৃষ্টিগতভাবে বিরাজ করে। মানুষের মধ্যে থাকা জ্ঞানী সত্তা যদি তার অজ্ঞ সত্তার আঘাতকে প্রতিহত করতে না পারে তবে অজ্ঞতাই হয়ে উঠে তার আসল পরিচয়। অজ্ঞ সত্তাকে প্রতিহত করা সহজ কাজ নয়। কারণ শয়তান সর্বদাই তার সাথে আছে। এজন্যই মূলত শয়তান মানুষের চিরশত্রু। অজ্ঞ সত্তা যখন আধিপত্য বিস্তার করে তখনই মানুষ তার সবচেয়ে বড় শত্রুকে ভুলে বশে। তখন জ্ঞানীর সংস্পর্শে আসলেও জ্ঞান কোন উপকার করে না। জ্ঞানীর সংস্পর্শের উপকার তখনই পাওয়া যাবে, যখন নিজের জ্ঞানী সত্তা তার আসল শত্রুকে চিনতে পারবে।

পৃথিবীতে আজ অবধি জন্ম নেয়া সকল মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা ছিলেন, তারা সকলেই দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন আমাদের মধ্যকার অজ্ঞ সত্তাকে প্রতিহত করার জন্য। তাদের কাজ ছিল মানুষকে এটা মনে করিয়ে দেয়া যে, জ্ঞান নামক অসীম শক্তিটি তাদের মধ্যেই ছিল। এটাকে ভুলে যাওয়ার ফলেই তারা অসীম সত্তাকে ভুলে বসে আছে। আরবী ভাষায় 'যিকির' শব্দের অর্থ স্মরণ করা। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে উপদেশ দেয়া। প্রকৃতপক্ষে, কাউকে উপদেশ দেয়ার অর্থ তাকে তার জ্ঞানসত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। উপদেশের ফলে জ্ঞানসত্তার জাগরণ ঘটলে তবেই উপদেশ কাজে লাগে।

সক্রেটিসের একটি বিখ্যাত বাণী উক্ত ব্যখ্যার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়- **"জ্ঞানের শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে উত্তর জেনে দেখানো যে, জ্ঞানটা তার মধ্যেই ছিল।"**

একটি পঙক্তি

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর প্রতি তার উস্তাদ ইমাম ওকী (রহ.) এর উপদেশ কবিতার পঙক্তি হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ- فان العلم نور من اله و نور الله لا يعطى لعاص

(জ্ঞান আল্লাহর একটি নূর, এটা পাপীদের দেয়া হয় না)

প্রশ্ন হওয়া সঙ্গত যে, জ্ঞান যদি পাপীদেরকে না-ই দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে জ্ঞানীরা কি নিষ্পাপ?

কথাটির প্রেক্ষাপট ছিল এমন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তার শিক্ষকের নিকট অভিযোগ করলেন যে, তার স্মৃতিশক্তি দূর্বল। আর তার শিক্ষক তাকে উপদেশ দিলেন, পাপকাজ ছেড়ে দিতে। কারণ জ্ঞান আল্লাহপ্রদত্ত নূর, এটা পাপীদের দেয়া হয় না। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, শাফেয়ী (রহ.) পাপী কিনা এটা তার শিক্ষক কি করে জানলেন? যদি না-ই জেনে থাকেন তাহলে কেন তাকে পাপ ছাড়তে বললেন!

এর ব্যখ্যা হিসেবে আরেকটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে- **طاعة العاصين معصية المقربين**। (সাধারণের ইবাদত আল্লাহর নিকটবর্তীদের জন্য গুনাহর সমতূল্য) অর্থাৎ আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দারা যদি সাধারণের ন্যায় ইবাদত করে, তাহলে সেটাও তাদের জন্য এক প্রকার পাপ। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তার অসাধারণ মেধাকেও জ্ঞানচর্চার জন্য যথেষ্ট মনে করতেন না। তিনি চাইতেন জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করার। আর তাই উস্তাদের কাছে অভিযোগ করলেন নিজের দূর্বল স্মৃতিশক্তি নিয়ে। বিজ্ঞ উস্তাদও বুঝে নিলেন, তাকে কোন পথ দেখানো উচিত। তাই বলে দিলেন পাপ ছেড়ে দিতে। অর্থাৎ সাধারণের পথ ছেড়ে আল্লাহর নিকটে পৌঁছানোর মত জ্ঞান সাধনা করতে। জ্ঞানীরাই আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে কাছের বান্দা।

সাধারণের মত চিন্তা করা জ্ঞানীর জন্য অপরাধ। সাধারণের মত জ্ঞানসাধনা জ্ঞানীর জন্য অপরাধ। জ্ঞানীরা জ্ঞানসাধনার পথে তা-ই করবে যা

সাধারণ মানুষ ভাবতেও পারে না। সাধারণ মানুষ নির্ভর করবে নিজের মস্তিষ্কের ক্ষমতার উপর। জ্ঞানীরা চেষ্টা করবে মস্তিষ্ক ব্যবহারের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার। সাধারণের চিন্তার বাইরে যারা যেতে পেরেছেন তারাই পেয়েছেন অসীম জ্ঞানের পরশ। তাদেরকেই আজ পৃথিবী চিনে।[৪৭]

---

৪৭. ইতিহাসে এরকম উদাহরণের অভাব নেই। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কখনো ফজর থেকে জোহর, জোহর থেকে আসর, আসর থেকে মাগরিব, মাগরিব থেকে এশা, এমনকি এশা থেকে আবার ফজর পর্যন্ত জ্ঞানসাধনায় কাটিয়ে দিতেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর একরাত্রে বিছানায় শুয়ে ৩০০ প্রশ্নের সমাধান বের করার ঘটনাটি বহুল প্রসিদ্ধ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এত বেশি হাদীস অধ্যয়ন করতেন যে, তার ব্যাপারে বলা হতো- তিনি যে হাদীস জানেন না সেটা হাদীসই নয়। ইমাম গাযযালী (রহ.) এর সমগ্র জীবনের রচনার পরিমাণকে তার জীবদ্দশার দিন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে গড়ে দৈনিক ১৬ পৃষ্ঠা করে হয়। তার রচিত 'এহইয়াউ উলুমুদ্দীন' কিতাবের ব্যপারে জনৈক দার্শনিক মন্তব্য করেছিলেন যে, তার সারাজীবনের সময়কাল এই একটি কিতাব লেখার জন্য যথেষ্ট ছিলনা। ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ.) রচিত তাফসীর গ্রন্থটির ব্যাপারেও ইতিহাসবিদগণ হিসেব মেলাতে পারেননি যে, দৈনন্দিন সকল কাজ ঠিক রেখে এরকম একটি কিতাব এত সংক্ষিপ্ত জীবনকালে কি করে লেখা সম্ভব! আরবী ব্যকরণের বিখ্যাত কিতাব 'কাফিয়া' এর কতগুলো ব্যখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। এটাকে কেউ যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিতে, কেউ দর্শনের দৃষ্টিতে, কেউ সাহিত্যের দৃষ্টিতে, আবার কেউ তাসাউফের দৃষ্টিতেও ব্যখ্যা করেছেন। অথচ লেখক ইবনে ওমর হাজেব (রহ.) কিতাবটি রচনা করেছিলেন খুব কম বয়সে। আল্লামা আলূসী (রহ.) রচিত তাফসীরে রুহুল মাআনী এত উচ্চ মানের তাফসীর যে, আরবী ভাষার গভীর জ্ঞান ব্যতীত এ তাফসীর অধ্যয়ন সম্ভব নয়। অনেকের মতেই এ তাফসীরের অনুবাদ অসম্ভব। ভাবানুবাদ হতে পারে, অনুবাদ নয়। এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের প্রতিটি পাতায়। যেখানে জ্ঞানীদের সাধনা সাধারণের চিন্তাকে অতিক্রম করে গেছে।

একটি প্রবাদ

ইতালিয়ান প্রবাদে আছে- "চিন্তা কর বেশি, কথা বল কম, আর লিখ তার চেয়েও কম।"

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এ প্রবাদটি মেনে চলেন। তারা এ কথা ভেবে কূল পান না যে, চিন্তা ছাড়া মানুষ বাঁচে কি করে? ফলে তাদের বলা কথার চেয়ে না বলা কথার পরিমাণ অনেক বেশি। আজ অবধি পৃথিবীতে যা কিছু বলা হয়েছে, তার চেয়ে না বলা কথার পরিমাণ অনেক বেশি। তার সবই যদি বলা হতো, তাহলে হয়ত এমন অনেক কিছুই হতো, যার জন্য পৃথিবী প্রস্তুত নয়, যা কারো কাম্য নয়। চিন্তাশীলদের কাছে বলার চেয়ে না বলার আনন্দ অনেক বেশি। লেখার ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করাটা তাদের কাছে অর্থহীন। তাই তারা লেখেন না বললেই চলে।

মানুষ যা চিন্তা করে তার সবই বলা সম্ভব নয়, যা বলা সম্ভব তার সবই লেখা সম্ভব নয়। মানুষ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক এই নিয়ম মানতে বাধ্য। তাহলে বাস্তবে কেন এটা প্রতিফলিত হবে না! সময়ের মূল্য দিয়ে যদি প্রতিটি কাজ করতে হয়, তাহলে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে হবে চিন্তার জন্য। তার চেয়ে কম কথা বলার জন্য। তার চেয়েও কম লেখার জন্য। তবেই লেখা বিষয়টি পাঠকের কাছে অনেক না লেখা কথাকে ফুটিয়ে তুলবে, তাকে বক্তৃতার ভাষায় তুলে ধরলে অনেক না বলা কথা শ্রোতার কানে বাজবে, তাকে চিন্তার জগতে নিয়ে গেলে চিন্তাশীলদের হৃদয় অজানার সন্ধানলাভে তৃপ্ত হবে।

কিন্তু চিন্তার জন্য সময় ব্যয় করা আমাদের দ্বারা হয়ে উঠে না। কথার তুবড়ি ছোটানোর জন্য নানা কৌশল অবলম্বনের চিন্তা আসল চিন্তাকে পিষে ফেলে দেয়। ফলে বলা কথাটি আর না বলার সন্ধান দেয় না। কথার সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করার কৌশল অবলম্বনের জন্য ব্যয়িত সময়ের চাইতে লেখার ভাষাকে ক্ষুরধার করার জন্য সময় আরো বেশি ব্যয় করি। ফলে আমাদের অবিবেচিত, বলার অযোগ্য, শ্রাব্য-আশ্রাব্য সবই লেখনীর জাদুতে মনোহর হয়ে উঠে। আর জ্ঞানের জগতকে পদ-পিষ্ট করা জ্ঞান পিপাসুরা দুধের স্বাদ ঘোলে মিটায়।

পবিত্র কুরআনে মুমিনদেরকে চিন্তার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে কথার ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছে কঠোর সতর্কবাণী- ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد (মানুষ যে কথাই বলুক না কেন তা সংরক্ষণ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার সাথেই রয়েছে।)

লেখনীর শক্তিকে অজেয় করার জন্য চাই কথা বলার শক্তি, কথার ভাষা সমৃদ্ধ না করতে পারলে লেখার হাত চলবে না, আর চিন্তাহীন কথার ভাষা লেখার হাতকে সুস্থভাবে পরিচালনা করতে অক্ষম।

শেষ প্রশ্নঃ সাগর কবে পাহাড়ের গায়ে আঘাত হানবে?

মহাসমুদ্রের সকল ধূলিকণা একত্রে যদি বিদ্রোহ করে বসে অবস্থা কি দাঁড়াবে? হতে পারে কি, যে সাগরের বুকে মরুভূমি রচিত হবে? তারপর কি সেই মরুভূমির বালুকণাগুলো আরো সংগঠিত হয়ে পর্বতে পরিণত হবে, আর সাগরকে ঠেলে দিবে অনেক দূর, যেখানে তার মধ্যে থাকবে না কোন তেজ, থাকবে না তার ঢেউয়ের শক্তি, থাকবে না তার ধন-রত্নের গৌরব প্রকাশ করার মতো তেজদিপ্ত জবান, তার আওয়াজ কেউ শুনবে না, এক সময় যার শক্তি ছিল পর্বতের গায়ে আছড়ে পড়ার, সে তখন সাগরের পদচুম্বন করাকেই গর্বের বিষয় বলে মনে করবে! এভাবে কি **সকল পাহাড় একসময় সাগর ছিল?**

বিজ্ঞান বা দর্শন কি বলে জানিনা। কিন্তু ইতিহাস বলে, হ্যা! এরকমই ছিল। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে যদি সাগরের সাথে তুলনা করি, আর তারা নিজেদের ধনসম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও যাদের পদচুম্বন করে গর্ববোধ করে তারা যদি পাহাড় হয়ে থাকে তাহলে ইতিহাস এরকমই ছিল বলতে হবে। তাই যদি হয়, তাহলে এটাও সত্য যে, সাগরের ঢেউ পাহাড়ের পাদদেশে ধ্বস নামাতে সক্ষম, পাহাড়কে সাগরের বুকে বিলীন করে দেয়া সম্ভব। কিন্তু এটা বলার কেউ নেই যে, কিভাবে পাহাড়ের গায়ে আঘাত হানা সম্ভব? কিভাবে পাহাড়কে চূর্ণ করে তার গর্ভে লুকিয়ে থাকা গুপ্তধনকে সাগরগর্ভে একাকার করা সম্ভব? নিজেদের পদতলে পিষ্ট হওয়া মণি-মুক্তার মূল্যই বা কিভাবে দেয়া সম্ভব? কে দেবে? কবে দেবে?

ভাষার অলংকার যেখানে লেখনীর অস্ত্রকে ভোতা করে দেয়, সুরের মূর্ছনা যেখানে লেখনীর হাতকে নিস্তেজ করে দেয়, কল্পনার মায়াবী আচল যেখানে চিন্তার যৌবনকে বিপথে নিয়ে যায়, যুক্তির মোড়কে মিথ্যা যেখানে সত্যের চেয়েও বড় সত্য হয়ে ধরা দেয়ার প্রয়াস পায়, সেখানে কারো কাছে গভীর রহস্যের উন্মোচন আশা করা অর্থহীন। তবে অর্থহীন বিষয়ের অবতারণা যদি অর্থহীন না হয়ে থাকে তাহলে অন্তত একটা অর্থহীন প্রশ্ন করা যেতেই পারে, **সাগর কবে পাহাড়ের গায়ে আঘাত হানবে?-**

উত্তরে রবি ঠাকুরের কথা স্মরণ করতে হয়।

"মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া

রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।... হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!"- রবি ঠাকুর এ কথাগুলো কেন বলেছেন ঠিক জানিনা। লেখকরা কালের সীমা অতিক্রম করে যেতে পারেন অতীত কিংবা ভবিষ্যতে, শত বৎসর পূর্বের কোন ঘটনায় নিজের উপস্থিতি প্রমাণ করতে তাদের খুব একটা কষ্ট হয়না। এই যেমন ঠাকুর সাহেব চিন্তার ভেলায় চড়ে ভবিষ্যতে এসে ঘুরে গেছেন, আবার জেনেও গেছেন যা আমি ভাবছি, যা বলতে চাচ্ছি।

তার সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, লাইব্রেরির এই জ্ঞানসমুদ্র, যেখানে ভাষা চুপ করে আছে, প্রবাহ স্থির হয়ে আছে, শব্দগুলো কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছে, যেখানে চাইলেই সমুদ্রের গভীরে নামা যায়, যেখানে চাইলেই পর্বতের শিখরে উঠা যায়, যেখানে পথের শেষ নেই, যার গভীরতার তলানী খুঁজে পাওয়ার শক্তি পৃথিবীর কোন সমুদ্রের নেই, যার ভিতরে লুকিয়ে থাকা শক্তি-ঐশ্বর্য্যের সামনে গর্ব করার মতো সাহস সাগরের নেই, তার ভিতরের সকল শক্তি একত্র হয়ে যদি একবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে, সেদিনই কেবল সাগর পাহাড়ের পাদদেশ চূর্ণ করতে পারবে।

ইতিহাসের পুনঃঅবতারণা (বিবেক)

সুতরাং .....

এটা সে সময়ের কথা, যখন আরবের মরুর উত্তাপ বেড়ে গেছে বহুগুণ। যখন মরুভূমির প্রতিটি ধূলিকণা চৌদ্দ শতাব্দীর বিরহ বেদনা ভুলে গিয়ে অবশেষে ক্ষোভের অনলে ফুটছে। যখন ধূসর মরু তার বুক এক নিরক্ষরের জ্ঞানে ধন্য হওয়ার ইতিহাস গর্বভরে প্রকাশ করার পরিবর্তে লজ্জাভরে গোপন করছে। কারণ তার বুকে তখন জ্ঞানের জন্য আত্মোৎসর্গিত সুফফাবাসীদের পদচারণার বদলে শোভা পাচ্ছে বিলাসীদের উন্মত্ত নৃত্য।

এটা সে সময়ের কথা, যখন কোরআনের সুরের পরিবর্তে নর্তকীর নিক্কণ-ধ্বনিই বেশি প্রিয়। যখন মরীচিকার মাঝে রঙিন স্বপ্ন দেখে চোখ জুড়ায় বেদুইনদের উত্তরসুরিরা। যখন ভুবনমোহিনী সৌন্দর্যের ফাঁদে আটকা পড়েছে মরুচারীদের বিবেক, গায়িকার কণ্ঠের জাদুতে মোহিত হয়েছে তাদের কর্ণকুহর, নারীর আঁচলের পরশ কলমকে করে দিয়েছে কালি-শূন্য, কলমের বদলে হাতে শোভা পাচ্ছে নেশাতুর পানীয়ভর্তি পাত্র, বিলাসিতা হাতকে করেছে অবশ, হাত থেকে ছিটকে গেছে জ্ঞানের হাতিয়ার, অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে তাদের বাঁচানোর আর কেউ নেই।

এটা সে সময়ের কথা, যখন মরুবাসীদের দেখে কেউ বলবেনা, এ মাটিতেই জ্ঞানের আলোর সবচেয়ে বড় বিচ্ছুরণ ঘটেছিল। যখন হেজাজ থেকে ইরানের পথের প্রতিটি ধূলিকণা সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞান সাধনার ইতিহাস গোপন করতে চাইছে। যখন অজ্ঞানতা তাদের হাত থেকে জ্ঞানকে কেড়ে নিয়ে তুলে দিয়েছে কায়সার-কিসরার যুগের ক্ষমতালোভীদের মত প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের খেলনা। এটা সে সময়ের কথা, যখন 'জ্ঞানী'রা জ্ঞানকে পিষ্ট করে জ্ঞানের বিতর্ককে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়।[৪৮] যখন মরুর ধূলিকণা বিলাসী 'জ্ঞানী'দের ভার বইতে চায়না, সহ্যও করতে পারে না।

এটা সে সময়ের কথা, যখন দজলা-ফোরাতের প্রতিটি ঢেউ চিৎকার করে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আর তাদের আর্তনাদ শোনার চেষ্টা করছে কোন আত্মাভিমানী মন-

"আমরা তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন কিসরার প্রাসাদকে আলোকিত করার বার্তা নিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব দুনিয়ায় আগমন করলেন। আমরা তখনও

---

৪৮. জ্ঞান অর্জনের চাইতে তর্কে বিতর্কে জ্ঞান জাহির করার প্রবণতাটা এখন অনেক বেশি।

প্রবাহমান ছিলাম, যখন তাঁর জ্ঞানের আলোয় ধন্য হওয়া সৈনিকেরা আমাদের বুকে ঘোড়া নামিয়েছিল, আর আমরা তাদের পদচুম্বন করে ধন্য হয়েছিলাম। আমরা তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন আমাদের তীরে বসে আত্মত্যাগী মানুষগুলো রাতের পর রাত জ্ঞান সাধনায় কাটিয়ে দিত, আর তাদের দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হত, সেই শীতল অশ্রুকে মুর্খরা সুপেয় জল মনে করত।

আমরা তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন কুরআনের পক্ষে ফতোয়া দেয়া ব্যক্তির পিঠ চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হলো।[৪৯] আমরা তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন লক্ষ লক্ষ বই নিক্ষেপ করে আমাদের স্রোত রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হলো। আমরা তখনও প্রবাহমান ছিলাম, যখন ভন্ড নবীর দাবিদার আর বাতেনীদের হাতে শত শত জ্ঞানী ব্যাক্তির রক্ত ঝরল। আমরা তখনও প্রবাহিত হচ্ছি, যখন জ্ঞান সাধনায় দেশান্তর হওয়া আত্মত্যাগীদের পদচুম্বন করার পরিবর্তে আরবের মরু পান করছে বিদেশীদের তৈরি মদের উচ্ছিষ্টাংশ।"

এটা সে সময়ের কথা, যখন হাসান ইবনে সাবাহর ইতিহাসকে স্মরণ করে আফসোস করা হচ্ছে, অথচ ধারণা নেই তার আঘাতটা মূলত কোথায় ছিল। জ্ঞানের ধারকদের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে সেলজুকিদের পঙ্গু করে দেয়ার ইতিহাস যখন বইয়ের পাতাতেও স্থান পায়নি। যখন নিযামুল মুলকের শাসনকার্যের সফলতার কথা স্মরণ করে জাতি মাতম করছে, অথচ মাদরাসায়ে নিযামিয়ার অথৈ জ্ঞান সাগরের ঝাপটা চিন্তার বাঁধকে কাঁপাতে অক্ষম।

এটা সে সময়ের কথা, যখন ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের স্বপ্নধারী আবেগী মন ভুলে গেছে, ইহুদীদের এই আধিপত্যের মূলশক্তি তাদের জ্ঞানচর্চা। যখন মুকাদ্দাসের মাটি মুসলমানদের বলছে, তোমাদের জ্ঞানের সাগরে ঝাঁপ দিতে ভয় পাওয়াটাই আজ আমাকে ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়েছে।

এটা সে সময়ের কথা, যখন গোয়াদেল কুইভারের স্রোত কর্ডোভার জ্ঞান-সাগরের প্রবাহের তীব্রতার সাক্ষী। যখন প্রবাহমান স্রোতের তীরে দাঁড়িয়ে কোন অভিমানী জ্ঞানপিপাসু হারিয়ে খুঁজছে আন্দালুসের জ্ঞানের গুপ্তধন। যখন উদাস মনে চাঁদের পানে তাকিয়ে প্রিয়ার সৌন্দর্য খুঁজতে থাকা যুবককে চাঁদ বলছে-

"আমি তখনও উদিত হয়েছিলাম, যখন আব্দুর রহমানের উত্তরসূরিরা কর্ডোভার প্রতিটি ঘরে একেকটি গ্রন্থাগারের জন্ম দিয়েছিল, আমি তখনও উদিত হয়েছিলাম, যখন জ্ঞানচর্চা তার পথ হারালো কাব্যের কাছে এসে[৫০], আমি এখনো উদিত হচ্ছি

---

৪৯. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর ঘটনা। 'খলক্বে কুরআন' বা কুরআন সৃষ্টি কি না এ ফতোয়ায় খলিফার মতের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তাঁকে শাস্তি পেতে হয়।

৫০. মুসলমানদের মধ্যে বিলাসিতার জীবাণু প্রবেশ করার পর তার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে

যখন 'জ্ঞান কি?'- তা-ই অজানা অথচ তোমরা জ্ঞানের সাগরে নিজেদেরকে অবগাহনকারী ভেবে গর্ববোধ করছো।"

এটা সে সময়ের কথা, যখন বাগদাদ আর কর্ডোভার পর ইতিহাসের অন্যতম জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠা হিন্দুস্তানের মাটিতে জ্ঞানের সবচেয়ে বড় অপব্যবহার চলছে। যখন জ্ঞানচর্চা-কেন্দ্রের উপর ইংরেজদের প্রতিহিংসার ইতিহাস নিকট-অতীত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ ভুলে গেছে। এটা সে সময়ের কথা, যখন পথের ধারে গাছের ডালে আশ্রয় নেয়া লাশগুলোও মনে করিয়ে দিচ্ছে না জ্ঞানের অবদানের কথা।

এটা সে সময়ের কথা, যখন মানুষ ভুলে গেছে সুলতান মাহমুদের শক্তি আসলে কি ছিল। এটা সে সময়ের কথা, যখন জ্ঞানপিপাসায় মরণোন্মুখ কেউ জ্ঞানের সাগরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত অথচ তাকে টেনে ধরে পরম বন্ধু। এটা সে সময়ের কথা, যখন বক্তব্যের ঝাঁঝে ম্লান হয়ে যায় হিন্দুস্তানের জ্ঞানের আলোর পুরনো গৌরব।

এটা সে সময়ের কথা, যখন ইহুদীদের দুই হাজার বৎসরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে।[৫১] এটা সে সময়ের কথা, যখন মুসলিম বিশ্ব জ্ঞানের অভাব না বুঝে অজ্ঞানতার গর্ব করছে। এটা সে সময়ের কথা, যখন কথিত জ্ঞানপিপাসুরা লেখনীর নামে মুর্খদের সাহিত্যের বিষাক্ত রস পরম তৃপ্তিতে পান করছে। এটা সে সময়ের কথা, যখন মানুষ নিঃশ্বাস ব্যতিত বাঁচার স্বপ্ন দেখছে।[৫২] এটা সে সময়ের

জ্ঞানচর্চায়। তাদের কাব্যচর্চা এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যে, কবিতাকে তখন আর জ্ঞানচর্চার জন্য ব্যবহার করা হত না বরং তা ছিল শাসকদের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম। কবিরা শাসকদের গুণগান গেয়ে টাকা উপার্জনের চিন্তায় মগ্ন থাকত। আর শাসকরা সবচেয়ে বড় চাটুকারকে সবচেয়ে বেশি ধন-সম্পদ দিয়ে গর্ববোধ করতো। শাসকদের এই বিলাসিতা উমাইয়া থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগেই লক্ষ্য করা যায়।

৫১. ইহুদীদের গোটা বিশ্ব শাসন করার এক গোপন পরিকল্পনা সম্বলিত নথি ১৯০৫ সালে চুরি হয়ে যায়। যাতে তাদের পরিকল্পনার ২৪টি প্রটোকল ধাপে ধাপে বর্ণিত ছিল। নথিটি Protocols of elders Zionist নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা আছে, তাদের পরিকল্পনার সূচনা মূলত ঈসা (আঃ) এর সময় থেকেই। আর তাদের পরিকল্পনা শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়, বরং সকল অ-ইহুদীর বিরুদ্ধে, যদিও মুসলমানরাই তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষ সময়সীমা হিসেবে এ শতাব্দীকেই উল্লেখ করা হয়েছে। তারা তাদের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এতটাই অগ্রসর যে, একশত বছর আগে ফাঁস হওয়া সত্ত্বেও তাদের সকল পরিকল্পনা গত শতাব্দীতে পুরোপুরি সফল হয়েছে। এ বিষয়কে সামনে রেখে সমসাময়িক অনেকেই কিয়ামতকে কাছাকাছি মনে করে থাকেন। কারণ, কুরআনের আয়াত-وضربت عليهم الذلة والمسكنة (নিঃস্বতা ও অপমান তাদেরকে গ্রাস করবে) দ্বারা কিয়ামতের পূর্বে ইহুদীদের পরিণতির কথা বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে, সুতরাং তাদের পরিণতিও নিকটবর্তী। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)

৫২. জ্ঞান ছাড়া বাঁচা আর নিঃশ্বাস ছাড়া বাঁচা একই কথা।

কথা, যখন কথার তীক্ষ্মতার জোড়ে বিশ্বাস দূর্বলতার তলানীতে গিয়ে ঠেকছে। এটা সে সময়ের কথা, যখন পাত্র পানিভর্তি হওয়ার আগেই ফুটো করে তা বিলিয়ে দেয়ার মত 'উদারতা' দেখানো নিয়মে পরিণত হয়েছে আর সে পানি মাটি কামড়ে পান করাকেই সৌভাগ্যের কারণ মনে করা হচ্ছে।

জ্ঞান আবেগের ধার ধারেনা। আবেগের কাছে যত্নও পায় না। তাই সে আজ অভিমানী অতিথির মতো নিঃশব্দে বিদায় নিতে যাচ্ছে। তার শেষ কথাগুলো হয়তো এমন-

"আমি পৃথিবীকে পরিচালনা করি সেই শক্তি দিয়ে, যার তীব্রতা অনুভব করা তোমাদের জন্য কঠিন, কিন্তু তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। আমি আমার লালনকারীকে সেই সুখ দিয়ে থাকি, যাকে তোমরা চাঁদনি রাতে আধার আহরণের মত করে খুঁজে থাক, যা খুঁজে পাওয়া কঠিন, কিন্তু হারিয়ে ফেলা অসম্ভব। আমি তাদের হৃদয়রাজ্যে বসবাস করি, যাদের রাজপথে চলা তোমাদের জন্য মৃত্যুতুল্য কঠিন, কিন্তু সে পথ ছাড়া অন্যপথে চলা অসম্ভব। আমি তাদের সাথে সমরাঙ্গনে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হই, যাদেরকে ময়দানে নামানো কঠিন, কিন্তু বেঁধে রাখা অসম্ভব। আমি আমার পথে চলা অভিযাত্রীকে সেই কষ্ট দিয়ে থাকি, যাকে মেনে নেওয়া কঠিন, কিন্তু তাকে ছাড়া সুখের সন্ধান অসম্ভব। আমি আমার পর্বতের চূড়ায় আরোহনকারীকে ধারালো পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত করি, সে রক্তের ধারার উপর পথ চলা কঠিন, কিন্তু তাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। আমি আমার অনুসন্ধানকারীকে সেই পরশ পাথরের সন্ধান দেই, যাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন, কিন্তু হারিয়ে ফেলা অসম্ভব। আমি সেই পুষ্পকাননের পথে আমার সাথীদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই, যার পুষ্পের সৌরভ তোমাদের জন্য অনুভব করা কঠিন, কিন্তু তাকে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমি আমার সাগরে অবগাহনকারীকে রত্নভাণ্ডারের সন্ধান দেই, যার চাকচিক্যের সামনে চোখ খোলা রাখা তোমাদের জন্য কঠিন, কিন্তু তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়া অসম্ভব।"

"আমাকে নিয়ে পথচলা কঠিন, কিন্তু আমাকে ছাড়া চলা অসম্ভব।"